দরজার আড়ালে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কসমস-এর বই

কসমো স্ক্রিপ্ট
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশ কাল :
ফাল্গুন—১৩৬৮

প্রকাশিকা :
তাপসী সেনগুপ্ত
কসমো-ক্র্যাফ্ট
১১, নিতাই বাবু লেন
কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীযুগল কিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
সন্তোষ গুপ্ত

তাপসী ও রঞ্জিত সেনগুপ্তকে

এই লেখকের অন্যান্য বই :

ফিরে আসা

নিজের চোখে দেখা

আমি কোন দিন ভূত দেখিনি। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে কখনো একটা ভূতের সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলি।

ছেলেবেলা থেকে কত ভূতের গল্প পড়েছি, লোকের মুখে গল্পও শুনেছি অনেক রকম। আমাব খুব দুঃখ হতো, এতো লোক ভূত দেখতে পায় অথচ আমার ভাগ্যে আজও একটা ভদ্রমতন ভূত জুটলো না।

শহরের চেয়ে গ্রামেই বেশী ভূত থাকে। আমি গ্রামে গেছি অনেকবার কাটিয়েছিও বহুদিন, কিন্তু হায়, কোনোদিন একটাও ভূত চোখে পড়েনি। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কখনো দু'একবার মনে হয়েছে বটে যে দূরে ঘোমটা মাথায় একটি পত্নী দাঁড়িয়ে আছে, বুক একটু একটু কেঁপে উঠেছে ভয়ে কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেছি, কিছুই না একটা কলাগাছ।

বন্ধুদের সঙ্গে একবার বেহালার একটা বাগানবাড়ীতেও রাত কাটিয়ে এসেছিলাম। সেই বাগান বাড়ীটার বেশ সুনাম ছিল ভূতের হিসেবে, অনেকেই দেখেছে, প্রায় কেউ নাকি বিফল হয়নি। কিন্তু আমরা সারারাত জেগে বসে রইলাম, তাস খেললাম অন্ধকারে বাগানে ঘুরলাম, কিছুই হলো না। ভূতেরা আমাদের বয়কট করেছিলো। একমাত্র সে বাড়ীর ছাদে দেখেছিলাম একটা ভূতুম প্যাঁচা। আমাদের অবস্থা যেন বাঘ শিকার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বাজার থেকে খরগোশ কিনে ফিরে আসার মতন।

এই রকম অবস্থায় আমার পক্ষে ভূত সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এত চেষ্টা করেও যদি ভূতের দেখা না পাই, তা হলে ভূতদের আমিই বা কেন পাত্তা দিতে যাবো। অর্থাৎ আমি যেমন ভূতে বিশ্বাস করি না, তেমনি ভূতেরাও আমাকে বিশ্বাস করে না।

ভূতরাও আমাকে কখনো দেখে নি, সুতরাং আমাকেই বা তারা বিশ্বাস করবে কি করে।

এ সত্বেও অবশ্য ইংরেজি বাংলা ভূতের গল্প পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে। মাঝ রাত্তিরে একা থাকলে কখনো কখনো যে একটু আধটু গা ছম ছম করে না তাও না। কিন্তু লোকজনের সামনে আমি জোর গলায় ভূতের মুণ্ডপাত করি।

গত বছরেই আমি বীরভূমের একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু তপেন সেখানে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজে চাকরি পেয়েছে। কয়েকদিন খুব খাওয়া দাওয়া আর আড্ডা হলো। তারপর এক সন্ধে বেলা কথায় কথায় ভূতের গল্প সুরু হলো। তপেন বললো, এখানকার শ্মশানে কিন্তু রাত্তিরবেলা কেউ যায় না।

অমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেন ?

কি জানি সবাই ভয় পায়। এখানে রাত্তির বেলা কেউ মারা গেলেও সকালের আগে পোড়াতে নিয়ে যায় না। বহুদিন ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।

আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বললুম, চল, শ্মশানটা ঘুরে আসা যাক্।

তপেন বললে, ধ্যাৎ! এসব পাগলামি করার কোনো মানে হয় না।

তপেনকে আমি সাহসী ছেলে বলেই জানতুম। গ্রামে এসে ভীতু হয়ে গেছে। কিছুতেই শ্মশানে যেতে চায় না। তখন আমার মধ্যে একটা বাহাদুরি দেখাবার লোভ এসে গেছে। আমি যাবোই বলে গোঁ ধরলাম।

তপেন আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। বারবার বলতে লাগলো, কেন পাগলামি করছিস। তোর একটা কিছু বিপদ হয়ে গেলে তোর স্ত্রীর কাছে আমি কি করে মুখ দেখাবো বলতো ?

আমি বললাম, আমার স্ত্রী তোর মুখ দেখার জন্য ব্যাকুল এমন তো মনে হয় না।

গ্রামের রাস্তা ধরে তপেন অনেকখানি আমার সঙ্গে এলো। দূরে যখন শ্মশানটা দেখা যাচ্ছে তখনও তপেন একবার আমার হাত ধরে মিনতি করে বললো, সুনীল, প্লীজ যাস্‌নি আমার অনুরোধ রাখ।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক্ আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।

তপেন শেষ পর্যন্ত বললো, চল, তাহলে আমিও যাই যা হবার দু'জনেরই হবে।

আমি তপেনকে যেতে দিলাম না। একা একা সাহস দেখাবার লোভ ছাড়তে পারছিলাম না।

গ্রামের শ্মশান সাধারণত নদীর ধারে হয়। বীরভূমের অনেক শ্মশানে তান্ত্রিকরা সাধনা করেন শুনেছি। এই শ্মশাটাও নদীর ধারে। তবে খুবই ছোট নদী। এখন শুকনো। একটা বিশাল বটগাছের নিচে ঝুপসি অন্ধকার।

শ্মশানটার একেবারে কাছাকাছি এসে মনে হলো, ইস্ একটা টর্চ আনলে হতো। জায়গাটা বড় বেশী অন্ধকার আর দারুণ নির্জন ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু। বহুদূরের একটা কুকুরের অশ্রান্ত চিৎকার।

আমার চলার গতি কমে এলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তপেনকে আর দেখা যাচ্ছে না। একটা ভাঙ্গা কলসীর ওপর পা পড়তেই আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম।

পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দিলাম একি, আমি ভয় পাচ্ছি কেন? কিসের ভয়?

ভয় কাটাবার জন্য খালি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরালাম। তবু মনে জোর এলো না। মনে হতে লাগলো, ভূত না থাক সাপ টাপ তো থাকতে পারে। টর্চ আনা উচিত ছিল।

সিগারেটের সামান্য আলোয় কিছুই দেখা যায় না। একটা-একটা করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে লাগলাম। কিছু পোড়া কাঠ কয়েকটা ভাঙ্গা হাড়ি আর একটা ছেঁড়া মাদুর ছাড়া কিছুই

নেই। এখানে লোকে রাত্রে আসতে ভয় পায় কেন? কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

ঠিক এই কথাটা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা ঘটঘটাং আওয়াজ পেলাম। একটা মাটির হাড়ি যেন গড়াচ্ছে। চমকে ডান দিকে তাকাতেই দেখলাম দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর কি একটা বীভৎস প্রাণী এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

নিজের কাছে তো স্বীকার করতে লজ্জা নেই। সেই মূহূর্তে আমি অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেল। পা কাঁপতে লাগলো। না জীবনে আর কোনদিন আমি হাঁটতে পারবো না, কথাও বলতে পারবো না।

তক্ষুনি দূর থেকে তপেন ডেকে উঠলো, সুনীল, সুনীল। সেই ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে আমি দৌড়োলাম। দৌড়োতে গিয়েই এক আছাড়!

সেদিন যদি আমি আছাড় খেয়ে না পড়তাম, তা হলে সারা-জীবন আমাকে ভীতুই থাকতে হতো।

আমি আছাড খেয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা নেড়ি কুত্তা কেঁউ কেঁউ করে ডেকে ছুটে পালালো। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতন আমার শরীর থেকে ভয় চলে গেল একেবারে। আর কিছুই না, একটা ক্ষুধার্ত কুকুর মাটির হাড়ি চাটছিল। বহুদিনের কুসংস্কার অন্ধকার আর নির্জনতার জন্য সেটাকেই আমার মনে হয়েছিল অদ্ভুত কিছু। ভালো করে তাকাতে পর্যন্ত পারিনি।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাল। বিশেষত তপেনকে শোনাবার জন্যই আমার হাসি ক্রমশ আরও জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো।

তপেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি, কি হয়েছে? আমি বললাম, কিছু না! এবারও ভূতেরা আমাকে ভয় পেয়েছে।

যাই হোক এইভাবে আমি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের

মধ্যে এই ধারণাটা তৈরী করে দিতে পেরেছিলাম যে আমি ভূত একেবারে বিশ্বাস করি না। ভূতটুত আমার ধার ঘেঁষে না কখনো।

কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই কলকাতা শহরেই আমার জীবনে এমন একটা অভিজ্ঞতা হলো, যার ঠিক ব্যাখ্যা আমি আজও জানি না। ভূত আমি আজও দেখিনি। তবে আমার ঘরের দরজার আড়ালে কে এসেছিল, কে জানে?

ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলতে হয়।

বিয়ে করার পর আমি একটা সার সত্য জানলাম! মেয়েদের খুশী করতে গেলে একটা বাথরুমওয়ালা বাড়ীতে থাকা দরকার। বিয়ের পর, মেয়েদের কাছে স্বামীর যৌবন, কিংবা পৌরুষ কিংবা টাকা পয়সা কিংবা খ্যাতি সবই তুচ্ছ হয়ে যায়, যদি বাড়ীর বাথরুমটা ভালো না হয়। আমার স্ত্রী শান্তার স্নান করতে সময় লাগে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্নানের ঘরটা তার একটা বিলাসিতার জায়গা, সুতরাং আমি যে ফ্ল্যাট ভাড়া করি, বাথরুমটা কিছুতেই তার মনের মত হয় না। ফলে আমাদের গৃহ শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম, এই জন্য আমাকে ঘন ঘন বাড়ী বদলাতে হয়।

কলকাতা শহরে পছন্দ মতন ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। তাছাড়া প্রত্যেকবার নতুন ফ্ল্যাট নিতে গেলেই ভাড়া বেড়ে যায়—কিন্তু এসব কথা শান্তাকে বোঝানো যাবে না। বাড়ীতে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করার বদলে ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়ানো অনেক উত্তম কাজ!

তিন চারবার বাড়ী বদলাবার পর দক্ষিণ কলকাতায় লেকের ধারে আমরা একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম! ছিমছাম, ছোটো খাটো এবং পরিষ্কার, ঠিক যেন আমাদের জন্যই তৈরী। ভাড়াও সাধ্যের মধ্যে, দুটি বাথরুম। একটা একটু সাধারণ গোছের হলেও, শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুমটি এককথায় অনবদ্য। রীতিমত বড়, সাদা টালি বসানো, ধপধপে চকচকে। বাথরুমের জানলা দিয়ে দূরের মাঠ ও গাছপালা দেখা যায়।

শান্তার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। পরের রবিবারেই আমরা বাড়ি বদল করে ফেললাম।

নতুন বাড়িতে এসে একদিন আমি আমার বন্ধু-বান্ধবীদের নেমন্তন্ন করলাম। আর একদিকে শান্তা ওর বন্ধু-বান্ধবীদের নেমন্তন্ন করলো। রীতিমতন হৈ চৈ আনন্দে কাটালো কয়েকটা দিন। শান্তার সব সময় মন ভালো থাকে। আমি একটু বেশী রাত করে বাড়ি ফিরলেও বকুনি দেয় না। বুঝতে পারি সবই যেন ঐ বাথরুমের গুণ। শান্তা এখন স্নানের সময়টা বাড়িয়ে এক ঘণ্টা করেছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ও দু তিনটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শেষ করে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটলো দিন আষ্টেক বাদে। আমরা ঘুমোই অনেক রাত করে। প্রায় সারা শহর ঘুমিয়ে পড়ার পর। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সহজে আমার ঘুম ভাঙ্গে না।

আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম।

হঠাৎ শান্তা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, এই, এই শুনছো। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর আমার ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুম জড়িত গলায় আমি বললাম, কি ?

—কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ?

—এত রাত্রে আবার কে দরজায় ধাক্কা দেবে ? ও কিছু না। ঘুমোওনি এখনো ?

—ঐ তো আওয়াজ হচ্ছে, তুমি শুনতে পাচ্ছো না ?

আমি কান পেতে শুনলাম। হ্যাঁ একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বটে। খুব জোরে নয়। কেউ যেন খানিকটা দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, যাতে প্রতিবেশীদের ঘুম না ভাঙ্গে।

আমি শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করলাম, কে ?

আওয়াজটা থেমে গেল।

আমি বললাম, হাওয়ায় ধাক্কা লাগছিল বোধ হয়। কিছু না ঘুমোও।

শান্তা বললো, মোটেই হাওয়ার ধাক্কায় ও রকম শব্দ হয় না। স্বামী হিসাবে এবার আমার উঠে দেখা উচিত। নইলে শান্তা আমাকে ভীতু ভাববে। কিন্তু শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে কার ইচ্ছে হয়।

তবু উঠতে হলো। আলো জ্বাললাম। দরজা খুলে দেখলাম বাইরে কেউ নেই। বাইরের আলো জ্বেলে সদর দরজাও খুলে দেখলাম, সিঁড়িতে উঁকি দিলাম, কোথাও কেউ নেই।

আমি একটু অসামাজিক ধরনের মানুষ। বহুদিনই অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরাঘুরি করি। আমার বন্ধুরাও কখনো কখনো মাঝ রাত্তিরে এসে আমার বাড়ীতে হাজির হয়। সেই রকম কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দিলে অবাক হবার কিছু ছিল না।

কিন্তু কারুকে কোথাও দেখতে না পেয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতেই হলো যে হাওয়ায় ধাক্কা লেগেছে কিংবা ইঁদুর-টিঁদুর খট্‌খট্‌ করছিল। ফ্ল্যাটের মধ্যে ইঁদুর থাকা ভালো কথা নয়। শান্তা ইঁদুর দেখলে খাটের ওপরে লাফিয়ে ওঠে। কাল সকালে এর একটা কিছু করতে হবে। আলো-টালো নিবিয়ে আবার ফিরে এলাম। শান্তাকে একটু মৃদু বকুনি দিয়ে বললাম—কোথাও কিছু নেই শুধু শুধু ঘুম থেকে জাগালে আমায়।

শান্তা লজ্জা পেয়ে আমাকে খুশী করার জন্য বলল—সিগারেট খাবে? সিগারেট দেশলাই এনে দেবো?

আমি বললাম, না থাক ইচ্ছে করছে না।

আবার শুয়ে পড়লাম—সবে মাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে এই সময় আবার দরজায় শব্দ। এবার একটু জোরে।

শান্তা এবার রীতিমত ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই এই।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম কাল সকালে ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবো।

শান্তা আরো ভয় পেয়ে জিজ্ঞেসা করলো কে? কাকে। ইঁদুর—ধ্যাৎ ইঁদুর কখনো এত জোরে আওয়াজ করতে পারে!

ইঁদুররা কি যে পারে আর কি যে পারে না তা কি আমার পক্ষে

জানা সম্ভব। নিশ্চয়ই মস্ত বড় ধেড়ে ইঁদুর।

শান্তা বললো শব্দটা বাথরুমের দরজা থেকে আসছে।

এই একটা গুরুতর ব্যাপার। শান্তার প্রিয় বাথরুমে যদি ইঁদুর থাকে তাহলে তো সাংঘাতিক কথা। আবার আমাকে ফ্ল্যাট খুঁজতে হবে।

সুতরাং উঠতেই হলো। আগেরবার আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গিয়েছিল—এবার অল্পো শব্দ শুনতে পেলাম।

ঢক্-ঢক্—আমি ইঁদুর তাড়াবার ভঙ্গিতে হুশ হুশ করলাম তবু আরেকবার শব্দটা হলো। বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি বন্ধ আমি দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছি—শান্তা আমায় চেপে ধরলো ভেতরে যদি কেউ থাকে!

সুতরাং কণ্ঠস্বর মোটা করে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে ভেতরে কে?

আর কোনও সাড়া শব্দ নেই।

শান্তা বললো, আমার ভয় করছে। আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভয় পাওয়া মেয়েদের স্বভাব। অনেক সময় ভয় পেলে মেয়েদের মানায়। কিন্তু স্ত্রীর সামনে যে স্বামী সাহস দেখায় না তার জীবন ব্যর্থ।

আমি বীর দর্পে শান্তার হাত ছাড়িয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। কেউ ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করলো না। একটু অপেক্ষা করে বাবরুমের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই, কোনো ইঁদুরও না।

ভালো করে সব জায়গাটা পরীক্ষা করার পর আমি শান্তাকে ভেতরে ডাকলাম। শান্তাও দেখলো। বাথরুমের কোথাও বড়সড় ইঁদুরের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাও নেই।

শান্তা বললো, তাহলে কিসের শব্দ বলো তো?

—হাওয়া ছাড়া আর কি হবে?

হাওয়ায় কখনো এরকম শব্দ হয়?

থাকগে কাল সকালে সেটা চিন্তা করা যাবে। ভেতরে তো কেউ নেই দেখা গেল, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

আবার সব দরজা-টরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে। বেশ কিছুক্ষণ দুজনে আর কোনো কথা না বললেও দুজনেই আসলে কান খাড়া করেছিলাম, আর কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা।

আর শব্দ হলো না। শান্তা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমিও ঘুমোলাম।

পরদিন সকালে উঠে শান্তা আর আমি দুজনে মিলে আবার বাথ-রুমটা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলাম। সেখানে কোন রকম সন্দেহজনক চিহ্ন নেই। দিনের আলোয় অনেক কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। রাত্তিরবেলা অনেক ছোটখাটো শব্দও খুব জোরে শোনায়, সুতরাং দরজা ধাক্কানোর ব্যাপারটা সেই রকমই একটা কিছু হবে—এই রকম ভেবে নিতে হলো।

ব্যাপারটা আমি তেমন গুরুত্ব না দিলেও সেদিন আমি বাড়ি ফিরে এলাম সন্ধে হতে না হতেই। শান্তা খুব খুশী হলো। আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে একটা সিনেমা দেখে এলাম রাত্রির শো-তে। সারক্ষণ আমরা গত রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোন আলোচনা করিনি। শুতে যাবার আগে শান্তা বললো, জানো ঠিকে ঝি বলছিল, এই ফ্ল্যাটটায় খুব ঘন ঘন ভাড়াটে বদলায়!

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন?

—তা জানি না। আগের ভাড়াটেরা নাকি মাত্র পনেরো দিন থেকেই চলে গেছে।

—ভাগ্যিস গেছে, নইলে এমন চমৎকার ফ্ল্যাটটা আমরা পেতাম না।

—ফ্ল্যাটটা তো ভালোই। কিন্তু···

—কিন্তু আবার কি। আজ যদি আবার শব্দ হয় কালকেই আমি ইঁদুর মারার ওষুধ কিনে আনবো—

শান্তাকে আমি হাসি ঠাট্টায় ভুলিয়ে রাখলাম—তারপর এক

সময় ও ঘুমিয়ে পড়লো। আমি একটা বই খুলে জেগে রইলাম--বার বার তাকাচ্ছি দরজার দিকে। যেন আমি কারো প্রতীক্ষা করছি। সে এসে দরজা ধাক্কা দিলেই আমাকে খুলে দিতে হবে।

রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত বই পড়লাম। আজ আর কোনো রকম শব্দ নেই। তবু আমার ঘুম আসছে না। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ী যাচ্ছে। এ ছাড়া থম থম করছে রাত। বাথরুমের দরজাটার দিকে তাকালেই আমার মনে হচ্ছে ওপাশে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আমি আলো নেভাই নি বলে দরজায় ধাক্কা দিতে পারছে না।

কোন একটা কিছু সম্পর্কে বেশীক্ষণ ভাবলেই এই রকম সব চিন্তা আসে। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ে বাথরুমের দরজাটা খুললাম। ভেতরের আলো জ্বেলে ভালো করে দেখে নিলাম একবার। বাইরের দিকের জানালাটাও বন্ধ করে দিলাম হাওয়া আসবার কোন উপায় নেই। আজ আর কোন শব্দ হবে না।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি এমন সময় শান্তা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো কে? কে?

আমি শান্তা আমি।

তুমি ওখানে কি করছো?

আরে তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি? আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম।

শান্তা উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিজ্ঞাসা করলো তুমি সত্যি বাথরুমে গিয়েছিলে? সত্যি করে বলতো আজও নিশ্চয় আওয়াজ হয়েছিলো?

না না—কোন আওয়াজ হয় নি।

সত্যি বলছো।

হ্যাঁ—দেখো আর কোনদিন আওয়াজ হবে না। কিন্তু আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট বাদেই আওয়াজটা শুরু হলো।

ঠক্, ঠক্—

শান্তা আমাক জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, ওকি হলো তুমি বলো।

আমি বললাম চুপ শুনতে দাওনা।

—কি শুনবে?

·· দেখি আর কি হয়।

দরজাটা আর কয়েকবার ঢক্ ঢক্ করলো—কিন্তু আর কিছুই হলো না।

শান্তা চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আমি বললাম, একটা রাত জেগে থেকে দেখা যাক্ না কি হয়।

শান্তা বললো, তুমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি ভয়ে মরে যাবো।

—না, ঘুমো'বো না। আর একটা কাজ করা যাক্। বাথরুমের দরজাটা খুলে ফাঁক করে রাখা থাক না।

উঠে তাই করলাম। শোবার ঘরের পাশের বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখায় শান্তার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু অতি কষ্টে ওকে রাজি করালাম। আর কোনো শব্দ হলো না।

রাতটা কেটে গেল। সকালে উঠেই শান্তা বললো, এর একটা ব্যবস্থা না করলে তো চলে না। এইভাবে কি প্রত্যেকটি রাত না ঘুমিয়ে কাটাবো নাকি?

যত রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সব কটাই আমি শান্তাকে শোনালাম। যেমন, বাতাসের ধাক্কা তো হতেই পারে। তাছাড়া হঠাৎ কোনো গাড়ির ঝাঁকানিতে কিংবা এ বাড়ির অন্য কোনো ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার সময় নিশ্চয়ই এই দরজাটা কেঁপে ওঠে।

শান্তা বিশ্বাস করলো না। দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে বোললো, দেখেছো, কি রকম শক্ত দরজা: এমনিতে কিছুতেই নড়তে পারে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, লক্ষ্য রেখো তো দিনের বেলা কোনো আওয়াজ হয় কি না।

সেদিন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে আমার বাড়ী ফিরতে অনেক

রাত হয়ে গেল। বাড়ির বাইরের জগতটার সঙ্গে একবার জড়িয়ে পড়লে তখন আর বাড়ির কথা মনে থাকে না।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটু অপরাধ বোধ করলাম। শান্তা অনেকক্ষণ একলা আছে। রাত এগারোটা বেজে গেছে।

দু'তিনবার কলিং বেল টিপলাম, দরজা খোলে না। শান্তা কি ঘুমিয়ে পড়লো?

বেল টিপতে টিপতেই আমি ডাকলাম, শান্তা! শান্তা!

একটু বাদে দরজা খুললো। শান্তার চোখে জল। এটা আমার কাছে একটা নতুন ব্যাপার। দেরি করে বাড়ি ফিরলে শান্তা মাঝে মাঝে বেশ বকাবকি করে। কিন্তু প্রথমেই তো কাঁদে না।

আমি কিছু বলবার আগেই শান্তা বললো, আমি বেঁচে থাকি কিংবা মরে যাই, তোমার তাতে কিছু যায় আসে না, না?

অনুতপ্ত গলায় বললাম, শান্তা, এসব কি বলছো? হঠাৎ দেরী হয়ে গেল, মানে বোম্বে থেকে আমার এক পুরনো বন্ধু এসেছে। অনেকদিন পরে দেখা—

—বাড়ি ফিরে যদি দেখতে আমি মরে গেছি?

—ছিঃ, এসব কি বলছো? কেন কি হয়েছে? তুমি ভয়-টয় পেয়েছিলে নাকি?

—যাকে সারাদিন, সারা সন্ধ্যা একলা থাকতে হয়, তার কি ভয় পেলে চলে?

—কি হয়েছে বলো না? আবার কি দরজাটা······

—না কিছু হয় নি।

কাছে গিয়ে শান্তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম, লক্ষ্মীটি রাগ করো না। আর একদিনও দেরি করবো না।

এরকম কতবার বলেছো? জানো, এই ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল?

—যাঃ।

—আমাকে আজ দু'তিনজন বললো, মেয়েটি আমারই বয়সী

ছিল খুব সুন্দর দেখতে।

—থাক্ গে, রাত্তির বেলা আর ঐ সব গল্প বলতে হবে না। শোনো আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি, খাবো না। শুয়ে পড়া যাক্। আজ রাত্তিরটা ভালো করে ঘুমোতে হবে।

শান্তা আর কোনো কথা বললো না। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলো। জামা কাপড় বদলে আমি শুয়ে পড়ার জন্য তৈরী হলাম।

শান্তা বললো, আমি বাথরুমে যাবো। কিন্তু আমার ভয় করছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এর মধ্যেই ভয় পাচ্ছো! আলো জ্বালা রয়েছে। আমি জেগে আছি।

শান্তার গলার আওয়াজটা যেন বদলে গেল। অদ্ভুতভাবে বললো, আমি বাথরুমে গেলে তুমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে না তো!

আমি চমকে গিয়ে বললাম, কি বলছো কি? দরজা বন্ধ করে দেবো কেন?

সত্যি করে বলো, দরজা বন্ধ করে দেবে না? তুমি কোনোদিন আমাকে বাথরুমে আটকে রাখবে না?

বলতে বলতে শান্তা হু হু করে কেঁদে ফেললে, কি রকম যেন পাগলের মতন হয়ে গেছে। আমি ওর দু'হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললাম, শান্তা, শান্তা, কি হলো কি এসব? তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

শান্তা কোনক্রমে নিজেকে একটু সামলে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বললো সেই মেয়েটির স্বামী রাগ করে একদিন তাকে বাথরুমের মধ্যে আটকে রেখেছিল, মেয়েটি কত দরজা ধাক্কা দিয়েছে তবু খোলে নি। তখন লজ্জায় অপমানে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, যত সব গাঁজাখুরি গল্প। সেই মেয়েটিই বুঝি এসে রোজ দরজায় ধাক্কা দেয়। তা দেয় তো দিক না, সে তো আমাদের আর কোনো ক্ষতি করে না।

অনেকক্ষণ ধরে শান্তাকে বোঝালাম। তারপর এক সময় ও

শুয়ে পড়লো। আমি আলো নিভিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বাথরুমের দরজার পাশে। আলোতে প্রেতাত্মারা থাকে না শুনেছি। সেই দুঃখিনী মেয়েটি যদি দরজা ধাক্কাতে আসে আমি অন্ধকারেই দরজা খুলে তাকে দেখবো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়েছিলাম, কিছুই হোল না কোনো শব্দ নেই। তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এসে শোওয়া মাত্র দরজায় আওয়াজ হলো—ঢক ঢক ঢক ঢক।

শান্তা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ যে আবার আমি তড়াক করে বিছান' থেকে নেমে ছুটে এসে দরজা খুললাম। দারুণ আশা ছিল মেয়েটিকে দেখতে পাবো। কেউ নেই। অন্ধকারেও কারুকে দেখা গেল না। শুধুই অন্ধকার।

না ভুত আমার ভাগ্যে নেই। আমার চোখের সামনে ওরা কেন যেন কিছুতেই আসতে চায় না। তবে, সেই দরজার আড়ালে কি ছিল, কেন বাথরুমের দরজায় কুণ্ঠিত ধাক্কা পড়তো তা আমি কোনোদিন জানতে পারিনি।

আবার ফ্ল্যাট বদল করতে হয়েছে শান্তার জন্য। এ ফ্ল্যাটের বাথরুম তেমন ভালো না, কিন্তু শান্তা আর কোনো অভিযোগ করে না।

অন্য মানুষ

সোমেন রায় চৌধুরী রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু বেশী পান করা হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন ক্লাবে গিয়ে তিনি স্নুকার খেলেন আর তিন পেগ হুইস্কি খান। আজ এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে খেতে হয়েছে পাঁচ পেগ।

যাইহোক, তিনি সঠিক ভাবেই গাড়ি চালিয়ে ফিরেছেন বাড়িতে। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে তিনি সদর দরজার কাছে এসে দেখলেন,

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

লোকটির চেহারা তাঁর খুব চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু ঠিক ধরতে পারলেন না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

লোকটি দু'হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সোমেন রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্রে, কী ব্যাপার?

—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

—খুব চেনা চেনা লাগছে। ঠিক ধরতে পারছি না।

ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো।

সোমেন রায়চৌধুরী ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন তো বটেই। তারপর নিজের গায়ে খুব জোরে একটা চিমটি কাটলেন। তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে পড়েছেন?

লোকটিকে তিনি বললেন, আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন তো?

লোকটি হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি সেটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, হুঁ, মানুষই তো বটে, ভূত-টুত নয়। এতটাই নেশা হয়ে গেল যে চোখে উল্টো-পাল্টা দেখছি? তুমি কে ভাই! কোথা থেকে এলে? আমার তো কোনো যমজ ভাই নেই?

লোকটি বললো, ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

সোমেন রায়চৌধুরী ওপরের দিকে একবার তাকালেন। তিন-তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর স্ত্রী। স্বামীর ফিরতে বেশী রাত হলে রত্না বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

খানিকটা জরানো গলায় সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা কি জানো ভাই। রাত্তিরবেলা নেশা করে ফিরি তো, তখন আমার কোনো বন্ধু-টন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে আমার স্ত্রী বড্ড চটে যান। কাল আবার অফিস আছে। তুমি বরং কাল সকালে এসো।

লোকটি বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে।

সোমেন রায়চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে, না, না, যেও না। ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে যাবে, রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না। এসো ভেতরে এসো! এটা আমার নিজের বাড়ি। বউয়ের ভয়ে কি একটা লোককে একটু বসিয়ে কথা বলতে পারবো না? এসো এসো—

বাবুর সাড়া পেয়ে চাকর আগেই দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। এবার দু'জনকে এক সঙ্গে ঢুকতে দেখে বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো এক টাকার রসগোল্লার সাইজের গোল গোল।

সোমেন রায়চৌধুরী তার ঐ অবস্থা দেখে বললেন, কীরে ব্যাটা, অমনি করছিস কেন? তুইও নেশা করেছিস নাকি?

চাকরটি দৌড়ে ওপরে পালালো।

বসবার ঘরে ঢুকে, আলো জ্বেলে সে আলোয় লোকটিকে দেখে তিনি দারুণ চমকে উঠলেন। তিনি ঠিক যেন একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য লোকটির পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অবিকল তাঁর মতন। পয়তাল্লিশ বছর বয়েসেই সোমেন রায়-চৌধুরীর মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে, লোকটিরও তাই। তাঁর থুতনির কাছে একটা কাটা দাগ, ছেলেবেলায় ফুটবল খেলার স্মৃতি, এই লোকটিরও থুতনিতে হুবহু সেই রকম দাগ।

তিনি ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার? তুমি···আপনি··· কে? আমার সর্বনাশ করতে এসেছেন?

লোকটি বিনীতভাবে বললো, আপনি ভয় পাবেন না। আমি আপনার কোনো রকম ক্ষতি করতে আসি নি। আমার সব কথা শুনলেই আপনি বুঝবেন।

সোমেন রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললেন, আমি ভয় না পেলেও আমার স্ত্রী হঠাৎ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যদি আমাকেই চিনতে না পারে? আপনাকেই আমি ভেবে নেয়! এবার বলুন, আপনি কে? আমার মতন চেহারা পেলেন কী করে? আমি চোখে ঠিক দেখছি, না ভুল দেখছি?

লোকটি জিজ্ঞেস করলো, তার আগে আমি জানতে চাই, স্ত্রী কাকে বলে ?

সোমেন রায়চৌধুরী আরও অবাক হয়ে বললেন, সে কি মশাই ? আপনি স্ত্রী কাকে বলে জানেন না ? আপনি বিয়ে করেন নি ?

—আমি বিয়ের ব্যাপারও জানি না !

সোমেন রায়চৌধুরী ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আপনি স্ত্রীর সংজ্ঞা জানতে চান ? মানুষ যেমন বাড়িতে গোরু পোষে দুধ খাবার জন্য, তেমনি বাড়িতে একটি করে মেয়েছেলে রাখে বিনে পয়সায় নানারকম আনন্দ-টানন্দ পাবার জন্য। ভদ্রভাবে এরকম একটি মেয়েছেলে রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে, তার নামই বিয়ে।

পরক্ষণেই জিভ কেটে তিনি বললেন, আরে ছি-ছি, নেশার ঝোঁকে কী সব আবোল-তাবোল কথা বলছি, আমার স্ত্রী এসব শুনতে পেলেই সর্বনাশ ! না শুনুন, স্ত্রী হচ্ছে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে জীবন সঙ্গিনী, সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে পুরুষের সমান অংশীদার। ছেলে-মেয়ের জননী···বাড়িতে এই স্ত্রী যদি একটু ক্ষেপে থাকে মশাই, বুঝবেন যে জীবনের সব শান্তি তা হলে নষ্ট। এই যে দেখুন, আমি সামান্য দু'তিন পেগ ড্রিংক করি, তার জন্যই রোজ কত রাগারাগি।

লোকটি বসে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, আপনি আসছেন কোথা থেকে ? জানেন, আমি ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলাম, আমার মা বলতেন, তোর মতন আর একজনও দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন যে দেখছি, ঠিক আমার মতন আর একজন লোক ? আপনি কি অন্য গ্রহ থেকে আসছেন নাকি ?

লোকটি মুখ তুলে বললেন, ঠিক তাই।

সোমেন রায়চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, জানেন মশাই, যত রাত বাড়ে ততই আড্ডা

জমাতে বেশী ভালো লাগে। বাড়িতে একটু হুইস্কি আছে, এখন যদি সেটা নিয়ে বসা যেত, কিন্তু ঐ যে, জীবন-সঙ্গিনী আছেন। এখুনি জীবন সঙ্গীন করে তুলবেন। কাজের কথাটা চটপট করে বলে ফেলুন। আপনি যাত্রা দলে পার্ট করেন নাকি? ভালো মেক-আপ নিয়েছেন তো।

লোকটি বললো, আপনাদের ভাষায় যাকে নীহারিকা বলে, সেই রকম এক নীহারিকা—সাত আলোকবর্ষ দূরে, সেখান থেকে আমি আসছি।

—ওসব গাঁজাখুরি কথা ছাড়ুন। কাজের কথা বলুন।

—জানি, আমার কথা আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, তাই আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন।

সোমেন রায়চৌধুরী দেখলেন, চোখের নিমেষে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি বললেন, যাঃ বাবা!

আবার ঠিক এক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল লোকটি ঠিক সেখানেই বসে আছে।

সোমেন রায়চৌধুরী খুব একটা অভিভূত হলেন না। হাই তুলে বললেন, এতো ভেল্কি! পি সি সরকার এ রকম কত মানুষ অদৃশ্য করে দিয়েছে। হঠাৎ রাত্তির বেলা আমাকে ম্যাজিক দেখাতে এলেন কেন? পয়সা-টয়সা পাওয়ার আশা নেই কিন্তু। আমি মহা কঞ্জুষ! কারুকে এক পয়সা দিই না।

লোকটি বললো, আমি আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। পৃথিবীতে আমার মতন কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে কয়েকটি পরীক্ষা চালাবার জন্য। প্রায় এক মাস ধরে আমি আপনাকে অনুসরণ করছি। আপনার বাইরের জীবন মোটামুটি সব জানি। এখন আপনার বাড়ির ভেতরকার জীবনটা জানতে চাই।

—আপনি আমার সম্পর্কে কী জানেন? শুনি তো!

—আপনি স্টিফেন ব্যাকক্ক অ্যাণ্ড কোম্পানির চীফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট। অফিসে সাতটা পর্যন্ত থাকেন। আপনার অফিসের

চেয়ারের মাথায় একটা তোয়ালে ঢাকা থাকে। আপনি দুপুরে লাঞ্চে খেতে যান একটা চীনে দোকানে। আপনি বেশী ঝাল পছন্দ করেন।

—এ সব জানা আর শক্ত কী? এ তো আমার অফিসের বেয়ারাটাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।

ঠিক চল্লিশ মিনিট অন্তর আপনার বাঁ দিকের ভুরু কাঁপে, আপনি ইংরেজি ভাষা লেখবার সময় টি'র মাথা কাটতে আর আই-এর ডট দিতে ভুলে যান। আপনি অকারণে বাথরুমে বেশী সময় থাকেন, আয়নার সামনে দাঁড়ালেই অন্যমনস্ক হয়ে যান।

—ঠিক, ঠিক।

—আপনি সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় থেকে রাত্রে ফেরার সময় পর্যন্ত আপনাকে সব জায়গায় অনুসরণ করেছি। আপনার সেই জীবন আমি সবটুকু জানি। এখন আপনার বাড়ির ভেতরের জীবনটা জানা দরকার আমার। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু, পৃথিবীর একজন মানুষের জীবন।

সোমেন রায়চৌধুরী এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনি সীরিয়াস? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না?

— না।

—আপনি সত্যি অন্যগ্রহ থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—কত দূরে আপনাদের গ্রহ?

—আপনাদের হিসেবে পাঁচ আলোকবর্ষ দূরে।

—আপনার বয়স কত? আপনাদের ওখানে সাধারণ মানুষের বয়স কত?

—আমার বয়স তেইশ। আমাদের ওখানকার গড় আয়ু এক শো।

—দেখুন, আমিও খানিকটা লেখাপড়া জানি, সামান্য বিজ্ঞান বুঝি। আমি এটুকু বলতে পারি যে পাঁচ আলোকবর্ষের পথ তেইশ বছরের কোন ছেলের পক্ষে পেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ডেঁপো

ছোকরা কোথাকার। এক আলোকবর্ষ মানে কত মাইল দূর জান? ১৮৬০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল। এবার হিসেবটা করতে পারবে? আমি পারি কারণ আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট। গুল ঝাড়বার আর জায়গা পাও নি?

লোকটি তবু মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললো, আমি কিন্তু আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।

—এত স্পীডে তোমাদের রকেট ছুটতে পারে? তা তোমার সেই রথখানা কোথায় রেখে এসেছো? কলকাতার গড়ের মাঠে?

—না, আমরা রকেটে আসিনি। কোনো রকেট সত্যিই এত জোরে ছুটতে পারে না। আমাদের সেরকম রকেট নেই। কিন্তু আমরা একটা জিনিস পারি, যা পৃথিবীর মানুষ এখনো পাবে না। আমরা শরীরের প্রতিটি উপাদানকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। অর্থাৎ ম্যাটার থেকে এনার্জি। তারপর সেই এনার্জি মিশিয়ে দিই আলোর সঙ্গে। এই রকম ভাবে ঠিক পাঁচ বছর আগে আমাদের গ্রহ থেকে যাত্রা করে আমরা এখানে পৌঁচেছি।

—আমরা মানে?

—আমরা একশো জন ছাত্র এসেছি পৃথিবীতে গবেষণা করতে।

—একদম সব নেশা কাটিয়ে দিলে ভাই! এ সমস্ত কী কথা এত রাত্রে? হঠাৎ এত লোক থাকতে আমার কাছেই বা এলে কেন?

—এমনিই এক একজন মানুষকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

—এখন কী করতে চাও?

—আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি আপনার বাড়িতে সাতদিন থাকতে চাই। আমি অদৃশ্য হয়েও থাকতে পারতাম। কিন্তু তাতে শারীরিক দুঃখ কষ্ট, আনন্দের অনুভূতি হয় না। সেগুলোও আমার বোঝা দরকার।

—তুমি এই চেহারায় আমাদের বাড়িতে থাকবে?

—হ্যাঁ।

—যদি আমি না বলি? যদি আমার আপত্তি থাকে?

—কেন, আপনি আপত্তি করবেন কেন ?

—এই বাজারে কেউ কোনো লোককে বাড়িতে রাখে ? জানা নেই শোনা নেই, একটা লোককে রাখলেই হলো ?

আপনার সেরকম আপত্তি থাকলে আমি চলে যাবো। আমাকে আবার নতুন ভাবে কাজ শুরু করতে হবে। অনেকটা সময় নষ্ট হবে।

সোমেন রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আরে, আরে তুমি অভিমান করলে নাকি ?

—অভিমান ? সেটা কী

—তুমি অভিমান কাকে বলে জানো না ? সাহেবরাও জানে না। যাই হোক, আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাই না। তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি ? তুমি জানো, আমার স্ত্রী সুন্দরী ?

—আপনাদের সৌন্দর্যের ধারণা আর আমাদের সৌন্দর্যের ধারণা এক নাও হতে পারে।

- তোমাদের ওখানে কোন্ রকমের মেয়েদের সুন্দরী বলে ?

—সেটা খুব জটিল ব্যাপার, আপনাকে এক্ষুনি বোঝানো যাবে না।

—যাই হোক, তুমি এখন পৃথিবীর মানুষ সেজে আছো, পৃথিবীর মেয়েদের তুলনায় আমার স্ত্রীকে যথেষ্ট সুন্দরীই বলা যায়। তুমি যদি আমার স্ত্রীর প্রেমে পড়ে যাও, তাহলে কী হবে ?

—প্রেম ?

—ও তুমি প্রেমও বোঝো না ? যাই হোক, মোট কথা তোমাকে আমার স্ত্রী যে-কোনো সময় নিজের স্বামী ভেবে ফেলতে পারে তারপর ? তুমিই রত্নার স্বামী হয়ে রইলে, আর আমাকে তাড়িয়ে দিলে এমন যদি হয় ? আমি কী করে প্রমাণ করবো যে আমি আমিই ?

—আপনার সে বিষয়ে কোনো চিন্তা নেই। আপনাদের সময়ের

হিসেবে ঠিক সাতদিন বাদে আমি চলে যাব।

—তাও না হয় বিশ্বাস করলুম। কিন্তু আমার স্ত্রী কি রাজি হবে! একই বাড়িতে একজন মেয়ের দু'জন স্বামী, এটা কি সমাজ মেনে নেবে?

দরজার বাইরে আওয়াজ হলো, বাবু, বাবু।

ভয়ার্ত গলায় বাড়ির চাকর ডাকছে।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ঐ দেখুন! ওপর থেকে ডাক এসে গেছে। রত্না ভেবেছে আমি নিশ্চয়ই কোনো বন্ধুকে ডেকে এনে আবার বোতল খুলে বসেছি।

উঠে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, এই যা দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো?

কিন্তু রত্না নিজেও নেমে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে।

সোমেন রায়চৌধুরী ছুটে ফিরে গিয়ে সেই লোকটির পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললেন, এই রঘু তোর দিদিমণিকে ভেতরে আসতে বল্।

রত্না দরজার সামনে দাঁড়িয়েই বললো, একি?

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ভেতরে এসো, ভেতরে এসে ভালো করে ত্যাখো!

রত্না ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানেই।

সোমেন রায়চৌধুরী মজা করে বললেন, এইবার বেছে নাও তো কে তোমার স্বামী! চিনতে পারবে? মনে করো দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হচ্ছে। দময়ন্তী কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিল নলকে।

রত্না এবার নিজের স্বামীর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললো, উনি কে?

—চিনতে পেরেছো তাহলে? দময়ন্তীর স্বয়ংবরের সময় যেমন স্বর্গ থেকে দেবতারা এসেছিলেন, তেমনি ইনিও এসেছেন গ্রহান্তর থেকে। দেখো, একে তোমার পছন্দ হয়? এর কিন্তু বয়স অনেক কম।

রত্না আবার জিজ্ঞেস করলো, ইনি কে? বলো না, ইনি কে?

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে নমস্কার করলো রত্নাকে।

রত্নার স্বামী বললেন, ইনি আমাদের গ্রহান্তরের বন্ধু। আমি এর নাম জানি না অবশ্য। তবে ধরে নাও এর নামও সোমেন রায়চৌধুরী!

রত্না এবার সেই লোকটিকেই জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

লোকটি বললো, আপনার স্বামী ঠিক কথাই বলেছেন।

—একরকম চেহারা? এরকম সত্যি হয়?

সোমেন রায়চৌধুরী স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, একদম হুবহু এক চেহারা নয়? রত্না তুমি কি করে আমাকে চিনতে পারলে?

—তোমার গলার আওয়াজ শুনে।

—ওর গলার আওয়াজও তো আমারই মতন।

—কিন্তু ওর গলা শুনলেই মনে হয় উনি অচেনা কারুর সঙ্গে কথা বলছেন? তোমার মতন স্বাভাবিক নয়।

-ইনি কী বলছেন জানো? ইনি কয়েকদিন তোমার স্বামী হিসেবে এখানে থাকতে চান। তুমি যদি রাজি থাকো, বলো, সেই সাতদিন ছুটি নিয়ে আমি অন্য কোথাও কাটিয়ে আসবো।

—কী পাগলের মত কথা বলছো? খুব বেশী নেশা করেছো আজ?

--অমনি নেশার দোষ হয়ে গেল। তুমি তো নেশা করো নি? তুমি সত্যিই আমার মতন আর একটা লোক দেখতে পাচ্ছো কিনা?

—তা তো পাচ্ছি! কিন্তু কে ইনি?

লোকটি এবার এক পা এগিয়ে এসে বললো, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্য গ্রহ থেকে এসেছি, মানুষের জীবন নিয়ে কিছু গবেষণা করতে। আমি কয়েকদিন এ বাড়িতে থেকে আপনার স্বামীর মতন জীবন কাটাতে চাই।

সোমেন রায়চৌধুরী ইয়ার্কি করে বললেন, একেবারে ঠিক ঠিক

আমার মতন জীবন কাটাতে গেলে, রত্নার সঙ্গে তোমাকেও ভাই এক বিছানায় শুতে হবে। আবার বকুনি খেতে হবে।

রত্না বললো, তুমি চুপ কর তো। বড্ড বাজে কথা বলছো।

—এই যে দেখছেন তো, শুরু হয়ে গেছে বকুনি।

লোকটি রত্নাকে বললো, আপনার যদি আপত্তি থাকে—

রত্না বললো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ কখনো হয় নাকি ?

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, বেশ মজার ব্যাপার হবে কিন্তু।

লোকটি বললো, আচ্ছা তা হলে আর একটা কাজ করা যায়। ধরুন যদি আপনার স্ত্রীর মতন ঠিক এক রকম আর একজন কেউ এখানে আসে ?

—আর একজন কারুকে পাবেন কোথায় ? ঠিক রত্নার মতন আর একটি মেয়ে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এরকম মেয়ে শুধু পৃথিবীতে কেন, সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, মহাকাশের কোথাও পাওয়া যাবে না। কী রত্না, ঠিক বলিনি ?

—আঃ, তুমি সব সময় বড্ড ইয়ার্কি করো।

লোকটি বললো, ধরুন যদি পাওয়া যায়।

—তা হলে কী হবে ?

—তার সঙ্গে আমি স্বামী স্ত্রীর মতন থাকবো, আপনারা দু'জনে যেমন ভাবে জীবন কাটান, ঠিক সেটা অনুকরণ করে যাবো !

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, পারবেন না। আমি বাজি রেখে বলছি, আর কোনো মেয়ে রত্নার মতন ব্যবহার করতেই পারবে না !

লোকটি দু'বার শিস দিয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যাশ্চর্য আর একটা কাণ্ড হলো। প্রথমে আলো নিভে গেল ঘরের। রত্না ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরলো স্বামীকে। তখন মনে হলো ঘরের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝড় বইছে।

আবার দুটি শিসের শব্দ শোনা গেল।

অমনি আবার জ্বলে উঠলো আলো। তাতে দেখা গেল হুবহু

একেবারে পায়ের শেষ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অবিকল রত্নার মতন একজন নারী দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে।

সোমেন রায়চৌধুরী আর রত্না দু'জনেই স্তম্ভিত। সোমেন রায়চৌধুরী ভাবলেন, এরকম ভেল্কি পি. সি. সরকারও পারতেন না!

অন্য সোমেন বললো, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি আমাদের গ্রহের একজন ছাত্রী। আমরা দু'জনে একসঙ্গে এখানে থেকে গবেষণা করবো।

রত্না অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলো দ্বিতীয় রত্নার দিকে। সেও দেখছে রত্নাকে। সোমেন রায়চৌধুরী দুই রত্নাকেই দেখতে লাগলেন বারবার। তারপর বললেন, চলুন, এই খেলাটা খেলে দেখা যাক। রত্না ওকে ওপরে নিয়ে চলো।

রত্না অন্য রত্নাকে বললো, আসুন!

সঙ্গে সঙ্গে আবার আলো নিভে গেল। আবার সেই রকম ঝড় বইলো। দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন আবার জ্বলে উঠলো আলো।

ঘরের মধ্যে সোমেন আর রত্না ছাড়া আর কেউ নেই। তখনও রত্না আসুন বলার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে আছে। সোমেন রায়চৌধুরীও অন্য লোকটির পিঠে হাত রাখবার মত হাতটা শূন্যে তুলে রেখেছেন।

রত্না বললো, একি হলো!

—তাই তো কোথায় গেল ওরা?

—একি স্বপ্ন দেখলাম?

—দু'জনে মিলে কি এক স্বপ্ন দেখা যায়?

দু'জনে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে। বাইরে তুমুল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। এক মিনিট আগেও বৃষ্টি ছিল না। রত্না জানালার গায়ে এসে দেখলো, এত বৃষ্টি যে রাস্তার জল জমে গেছে। এত বৃষ্টি সে টের পায় নি?

সোমেন রায়চৌধুরীও রাস্তার পাশের জানালার কাছে এসে বললেন, কখন বৃষ্টি হলো কিছুই জানলাম না? ওরা দু'জন আবার

অদৃশ্য হয়ে গেল ? রাস্তার মাঝখানে ওটা কি ?

—পাড়ার ছেলেরা বিশ্বকর্মা পূজো করছে। ঐ তো ঠাকুর।

—বিশ্বকর্মা পূজো তো সাতদিন পরে। আজ থেকেই ··

আসলে যেটাকে মনে হয়েছিল এক মুহূর্ত, তার মধ্যেই হয়ে গেছে সাতদিন। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা দু'জনে বুঝতে পারল সেটা। মাঝখানে সাতদিনের কথা ওদের একদম মনে নেই।

ওপরে এসে ওরা দেখলো, পাশের ঘরে দুটি আলাদা খাট বিছানা পাতা, বাথরুমে দুটি অতিরিক্ত টুথব্রাস। আরও অনেক চিহ্ন ছড়ানো। সত্যি তা হলে আরও দু'জনে এসে ছিল এখানে। কিন্তু ওরা কিছুই মনে করতে পারছে না।

বিছানার ওপরে দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, সাতটা দিন নিশ্চয়ই কেটে গেছে রত্না। আমি কেমন যেন টের পাচ্ছি। মানুষ হিসেবে আমি যেন খানিকটা বদলে গেছি। নিজেকে অন্য মানুষের মতন লাগছে। তোমার মনে হচ্ছে এরকম ?

রত্না ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সবুজ আলো

যে রকম পথে ঘাটে হিপিদের দেখা যায় লম্বা লম্বা চুলওয়ালা ছেলে ও মেয়ে অনেক সময় খালি পা, নোংরা পোষাক, সেই রকমই একজোড়া যুবক যুবতীকে আমি দেখেছিলাম, কিছুই অবাক হইনি।

ওরা পার্ক ষ্ট্রীটে চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, দু'জনেরই পোষাক এক রকম, প্যাণ্ট ও শার্ট, সোনালী রঙের চুল, হালকা নীল চোখের মণি, দুধে আলতা রং, অন্য হিপিদের মতন এরা তেমন

নোংরা নয়, যদিও পোষাক ছেঁড়া খোঁড়া।

ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলছিল। আমি দু-এক পলক ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম। ওরা এতই রূপবান যে না তাকিয়ে পারা যায় না। দুজনেরই মুখে অপরূপ সারল্য মাখানো।

আমি ভাবলাম, ওরা তো বেশ ভালই আছে। চাকরি-বাকরি কিংবা টাকা পয়সা উপার্জন কিংবা ঘর-সংসার নিয়ে থাকাই এই পৃথিবীর নিয়ম। এ নিয়ম বড পুরোনো হয়ে গেছে। ওরা যদি সে নিয়ম না মানে, তাহলে বুঝতে হবে ওরা অন্যরকম সুখ চাইছে।

অধিকাংশ হিপিই একরকম চেহারার হয়, এবং সাহেব মেমদের মুখ একবার মাত্র দেখে মনে রাখাও যায় না। সুতরাং ওদেরও মনে রাখার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু আমি ঘাম মুছবার জন্য যেই পকেট থেকে রুমাল বার করতে গেছি অমনি ঝনঝন করে কয়েকটা খুচরো পয়সা রাস্তায় পড়ে গেল। কয়েকটা গড়িয়ে গেল ওদের পায়ের কাছে।

আমি নীচু হয়ে পয়সা তুলতে গেলাম। ছেলে মেয়ে দুটিও পয়সা কুড়িয়ে আমার হাতে দিল। আমি হেসে বললাম থ্যাঙ্কয়ু। ওরা দুজনে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর কি বলল আমি বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় ওদের ভাষা ইংরেজী নয়। জার্মান, ফরাসী, ডাচ ছেলেমেয়েরাও তো হিপি হয়।

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। হাঁটতে লাগলাম ধর্মতলার দিকে। ওরা সেখানেই রইলো দাঁড়িয়ে।

মেয়েটির হাসি আমার এতই সুন্দর লেগেছিল যে আমি দু'একবার ওদের দিকে ফিরে না তাকিয়ে পারিনি। বেশীবার তাকানো আবার অভদ্রতা।

এটা একটা সামান্য ঘটনা। মনে রাখার মতন কিছু নয়। আমি মনেও রাখিনি।

এর কয়েকদিন পর আমি বেনারস গিয়েছিলাম, বেনারস তো

একেবারে হিপিদের রাজত্ব। রাস্তায় বিশেষত গঙ্গার ধারে শতশত হিপিদের যখন তখন দেখা যায়। এদের মধ্যে যদিও সেই দু'জন হিপিকে হঠাৎ একদিন দেখি, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি কিন্তু ওদের দু'জনকে ভীড়ের মধ্যেও চিনতে পেরেছিলাম। সেই মেয়েটির হাসি দেখেই চিনলাম। হাসিটা আমার চোখে লেগেছিল, মেয়েটির শরীরটা এত সুন্দর এবং মুখখানা এত লাবণ্যময় যে সিনেমায় নামলে দারুণ নাম করতে পারতো। তার বদলে একটা পাতলা জামা ও প্যান্ট পরে গঙ্গার ধারে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এর দুদিন পরে বেনারসে একটা ছোটখাটো দাঙ্গা লাগাব উপক্রম হলো। একদল লোক লাঠিসোটা এমনকি খোলা তলোয়ার হাতে রাস্তায় নেমে পড়লো। তারা সব হিপিদের তাড়াবে। কয়েক জন হিপিকে মারধোরও করলো খুব। তবে ঠিক সময় পুলিশ এসে পড়ায় বেশীদূর গড়াল না। অনেক গ্রেপ্তার হলো, লোকগুলো নাকি অধিকাংশই গুণ্ডা শ্রেণীর।

হিপিদের ওপর ওদের অত রাগের কারণটা পরে জানতে পারলাম।

বেনারসে আমি উঠেছিলাম আমার বন্ধু প্রশান্তর বাড়িতে। আমার বন্ধুর স্ত্রী গীতি যাকে বলে সরকারী গেজেট। রোজ সকাল-বেলা বাজার করতে গিয়ে গীতি যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে আনে।

গীতি আমাদের একটি লোমহর্ষক কাহিনী শোনালো।

বেনারসের আশেপাশে এখনো অনেক ছোটখাটো রাজা ও জমিদার রয়ে গেছে। যারা প্রায় মধ্যযুগীয় কায়দায় জীবন কাটায়। তারা নিজস্ব গুণ্ডা পোষে, অনেক সময় লোকজনকে খুন করে মৃতদেহ গায়েব করে দেয়, নানা জায়গা থেকে স্ত্রীলোকও ধরে আনে।

হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর মেয়ে আছে বলে অনেক সময় এই সব রাজা ও জমিদাররা গুণ্ডা দিয়ে হিপি মেয়েও লুঠ করে আগেকার দিনে কোনো মেমসাহেবকে ভোগ করার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। এখন অনেক সুযোগ। বেনারসে এত হিপি

মেয়ে গিসগিস করছে। তার মধ্যে দু'একজন হারিয়ে গেল কি না কে খোঁজ রাখে।

সেই রকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল গতকাল। একজোড়া হিপি ছেলেমেয়ে রাত্তির বেলা একটা সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিল, এই সময় তিনজন গুণ্ডা তাদের অনুসরণ করে। গুণ্ডাদের সঙ্গে লাঠি ও ছুরি ছিল।

গলিটা ছিল কানাগলি। এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে, সামনে দেয়াল। হিপি ছেলে ও মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল, তাদের পেছনে গুণ্ডা লেগেছে, কিন্তু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের আর পালাবার উপায় নেই, তাই পেছনে ফিরলো।

সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডা তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটির ওপর। মেয়েটি কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। সে চিৎকার করে কি যেন বলল ছেলেটিকে।

ছেলেটি একজন গুণ্ডাকে টেনে তুলল। তারপর সে গুণ্ডাটির দুটি হাত ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। ছিঁড়ে ফেলে মানে শরীর থেকে একেবারে ছিঁড়ে আলাদা করে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপরে সে গুণ্ডাটার চোখ দু'টো খুবলে নেয়।

গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি বললুম, গীতি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না।

গীতি তার সুন্দর মুখে দারুণ বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না? সবাই একথা শুনেছে!

—তারা কি করে জানলো? ওখানে কি আর কেউ উপস্থিত ছিল। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি যেন পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিলে।

—এসব কথা ঠিক জানা যায়, বুঝলেন, পরে সেই ডেডবডিটা অনেকে দেখেছে!

—বাকি গুণ্ডা দুজন কি করলো?

—তারা সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয় পালিয়ে গেল।

মানুষের হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলা একটা অমানুষিক কাজ। হিপিরা সাধারণত নিরীহ হয়। ওদের কাছে অস্ত্র থাকে না। তাছাড়া গাঁজা ভাঙ খেয়ে খেয়ে শরীরেও জোর থাকে না বিশেষ। তবে জুডো আর ক্যারাটি নামে কয়েক রকম যুযুৎসু আছে, যাতে একজন ছোট-খাটো মানুষও বিশাল চেহারার লোককে ঢিট করে দিতে পারে। কিন্তু হাত ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব।

আমরা এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলুম এমন সময় প্রশান্তর বন্ধু তুষার এলো।

তুষার সব শুনে বললো, গল্পটার অনেকখানি অংশ সত্যি। গতকাল রাত্রে কাশীর একটা সরু গলিতে একজন কুখ্যাত গুণ্ডার মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার একটা হাত কাটা অবস্থায় পড়েছিল পাশে। চোখ দুটোও গেলে দেওয়া হয়েছে।

তুষারের মামা এখানকার পুলিশের একজন হোমরা চোমরা অফিসার। তিনি দিয়েছেন এ খবর। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ রহস্য আছে।

মারা গেছে একজন কুখ্যাত গুণ্ডা—সে একটা মেয়েকে চুরি করতে গিয়েছিল—সুতরাং সে যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে বলা যায়। কিন্তু দেখা গেল, বেনারসে অধিকাংশ লোকই হঠাৎ ক্ষেপে গেল হিপিদের ওপরে। দাবি উঠলো সব হিপিকে তাড়িয়ে দেওয়ার। থাইল্যাণ্ড কিংবা শ্রীলঙ্কায় যে রকম করা হয়েছে। গুণ্ডারা বেনারসে চিরকালই ছিল। এবং থাকবে, তাদের ঘাটাবার কোন মানে হয় না।

শিক্ষিত লোকেরা বলতে লাগলো, হিপিদের মধ্যে সি. আই-এর দালাল এবং নানারকম স্পাই মিশে থাকে। ওদের এরকম যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কথাটার মধ্যে হয়ত সত্যি কিছু থাকতেও পারে। তবে, হিপিদের মধ্যে যে অন্য অনেক কিছু মিশে থাকে, তার প্রমাণ আমি পেলাম কয়েকদিন পরে।

বেনারসে ঐ ঘটনা শুনে আমার বারবার মনে হচ্ছিল আমি যে হিপি যুগলকে চিনি এই ব্যাপারটা বোধ হয় তাদের নিয়েই।

অবশ্য এর কোন ভিত্তি নেই। হাজার হাজার হিপি রয়েছে। তবে হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর মেয়ে থাকলেও ঐ মেয়েটির মতন অত সুন্দর আমি আর কারুকে দেখিনি।

শুনলাম অনেক হিপি বেনারস ছেড়ে চলে গেছে! নিশ্চয়ই ওদের স্বর্গস্থান নেপালে আরও ভিড় বাড়বে।

প্রশান্তর ফিয়াট গাড়িটা গ্যারেজ থেকে মেরামত হয়ে আসবার পরই ও বললো চলো কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

বেনারসে আমি বেশ কয়েকবার এসেছি, অনেক কিছু দেখা। শুধ্ চুনারে আমার যাওয়া হয়নি। তাই ঠিক হলো চুনারে যাওয়া হবে।

কথা ছিল, সকালে গিয়ে সন্ধ্যের আগে ফিরে আসা। কিন্তু চুনারের দুর্গের ওপরের গেস্ট হাউসটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি ভারতের বহু জায়গায় গেস্ট হাউসে থেকেছি, কিন্তু এমন সুন্দর জায়গা দেখিনিই প্রায় বলতে গেলে।

পাহাড় কেটে বসানো হয়েছে দুর্গ, সেই দুর্গে এক সময় যেটা ছিল দরবার এখন সেটাই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বিশাল বিশাল সুসজ্জিত ঘর। সামনে সুন্দর সাজানো চাতাল, অনেক নীচে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে বাঁক নিয়েছে। সন্ধ্যের আধো অন্ধকারে মনে হলো ঠিক যেন বাঁকা চাঁদ।

আমি গীতি আর প্রশান্তকে বললাম, এসো আজ রাতটা এখানেই থেকে যাই।

গীতি বললো, দারুণ জায়গা। আমারও থাকতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সঙ্গে জিনিসপত্র যে কিছু আনিনি।

প্রশান্তরও থাকার খুব ইচ্ছে, কিন্তু কাল সকালেই ওর অফিসের ব্যাপারে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

তখন ঠিক হলো, আমি একাই ওখানে থেকে যাবো। প্রশান্ত আর গীতি আজ ফিরে যাবে আবার ফিরে আসবে কাল বিকেলে। তারপর তিন চার দিন থাকা হবে।

গেষ্ট হাউসের ঘর দুটোই ফাঁকা ছিল, সুতরাং রিজার্ভেশন পেতে কোন অসুবিধে হলো না।

যাবার সময় গীতি আমায় বললো, সুনীলদা আপনার একা একা এখানে ভয় করবে না তো।

আমি বললাম, যাঃ ভয় আবার কি!

প্রশান্ত হাসতে হাসতে বললো, এখানে রাজা মহারাজাদের আমলে এত যুদ্ধ চলেছে, কত খুন জখম হয়েছে, তাদের ভূত-টুত থাকতে পারে।

আমি বললাম, ভূতরাও মিলিটারিদের ভয় পায়!

দুর্গটার এক অংশ এখন মিলিটারিদের দখলে। একদিকে একটা মন্দির আছে আর এই গেষ্ট হাউস শুধু জনসাধারণের জন্য।

আমি এক জামাকাপড়ে রয়ে গেলাম সেখানে। প্রশান্ত আর গীতি চলে যাবার পর আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সামনের চত্বরটায় বসে গঙ্গা দেখতে লাগলাম। সন্ধ্যের পর আর বাইরের লোকদের এখানে আসতে দেওয়া হয় না। জায়গাটা এখন খুবই নির্জন। অনেকদিন এমন নির্জনতা উপভোগ করার সুযোগ পাইনি।

—সাব!

আমি চমকে উঠলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ডাক বাংলোর চৌকিদার। সে জিজ্ঞেস করলো রাত্তিরে আমার জন্য খাবার বানাতে হবে কিনা।

তাইতো, নির্জনতা নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে আমি খাবার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম, কথাটা ভাবতেই আমার খিদে পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম খাবার কি পাওয়া যাবে?

সবচেয়ে সুখাদ্য এবং সহজে রান্না করা যায় অর্থাৎ ভাত আর মুরগীর মাংস, তার ব্যবস্থা আছে। আমি সেটারই অর্ডার দিলাম। এবং বললাম খুব জলদি বানাতে।

আপশোস হতে লাগলো কেন একটা হুইস্কি বা ব্রাণ্ডির বোতল

সঙ্গে আনিনি, তাহলে এই নির্জনতা আরও ভাল ভাবে উপভোগ করা যেতো।

চৌকিদারকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছিল। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। সে বললো, এনে দিতে পারে তবে অনেকটা সময় লাগবে। পাহাড়ের নীচে বাজারে যেতে হবে কিনা।

আমি তাকে পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে বললাম, যাও তাই নিয়ে এসো।

চৌকিদার চলে যাবার পর জায়গাটা আরও বেশী নির্জন মনে হতে লাগলো।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে গেলাম। চার পাশে এত সৌন্দর্য। মাথার ওপরে বিশাল আকাশ নীচেও বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, গঙ্গার রূপও এখানে অসামান্য, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে—তবু একা থাকার জন্য আমি এসব তেমন ভাবে উপভোগ করতে পারছি না। আমার একটু ভয় ভয় করছে।

ঠিক ভূতের ভয় নয় বরং চোর ডাকাতের ভয়ই বেশী।

চৌকিদারকে না পাঠালেই হতো। আমাকে এখানে একা পেয়ে কেউ যদি খুন করে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে যায়? আমার কাছে মাত্র শ' দেড়েক টাকা রয়েছে যদিও, কিন্তু এদেশে পাঁচ দশ টাকার জন্যও অনেক সময় মানুষ খুন হয়।

হঠাৎ মনে হলো, ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য আমার একটু শীত শীত করছে। আসলে এটা একটা অজুহাত। বাইরে একা বসে থাকতে আমার গা ছমছম করছিল।

ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বেশ নরম গদি। খুব আরামের।

একটুক্ষণ বাদেই আমি বাইরে কার যেন গলার আওয়াজ শুনলাম। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি চত্বরের একেবারে শেষ প্রান্তে গঙ্গার দিকে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে গল্প

করছে মনে হয়।

সিগারেট ধরিয়ে আমি বাইরে এলাম। অল্প চাঁদের আলোয় দেখলাম একজন সাহেব ও মেম। রাত্রে সাধারণত কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। তবে সাহেব ও মেমদের জন্য সব সময়ই অনেক বেশী সুযোগ সুবিধে থাকে। কিংবা হয়তো ওদের আগে থেকে ঘর রিজার্ভ করা ছিল।

একটু এগিয়ে এসে আমি দারুণ চমকে উঠলাম। সেই দু'জন হিপি যুবক যুবতী। এদের একবার আমি দেখেছি কলকাতায় পার্ক ষ্ট্রীটে, একবার কাশীতে আবার এখন চুনারে। আমি যেখানে যাচ্ছি এরা কি সেখানেই যাচ্ছে ?

নিজের মনকে বোঝালাম হয়তো ব্যাপারটা কাকতালিয় যোগাযোগ। হঠাৎ এ রকম মিলে যেতেই পারে। বেনারস থেকে হিপিরা বিতাড়িত হচ্ছে বলেই বোধহয় ওরা দু'জনে চুনারে এসেছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ওরা যখন আমার প্রতিবেশী, তখন ওদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে। এগিয়ে গিয়ে বললাম, হ্যালো।

ওরা একটু চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল হয়েছিল।

মেয়েটির দিকেই আমার প্রথম চোখ পড়েছিল। মেয়েটির মুখে সেইরকম হাসি নেই। বরং একটা রাগের ভাব। আমাকে কিছু না বলে দুর্বোধ্য কি একটা ভাষায় কিছু বললো ছেলেটিকে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম ওরা ইংরেজি জানে না।

আমি ছেলেটির দিকে তাকালাম। ভারতবর্ষে যখন ঘুরছে তখন কিছু একটা সুবোধ্য ভাষা তো জানবে। বোধহয় হিন্দী জানে। তাই আমি বললাম আপলোগ···

ছেলেটি আমায় কিছু বলতে দিল না। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আমার দিকে তাকালো। আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেলো। ছেলেটির দু'চোখ দিয়ে সবুজ রঙের আলো বেরুচ্ছে, দুটো

সবুজ আলোর রেখা এসে ভেদ করলো আমার মুখে। সে রকম ভয়ংকর দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি।

ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরলো। কি অসম্ভব গরম তার হাত। একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলেও মানুষের দেহে অতখানি উত্তাপ থাকে না।

স্বীকার করতে একটুও লজ্জা নেই। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারলাম না। সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝতে পারলাম এরা সাধারণ মানুষ নয়।

আমার মনে পড়ে গেল কাশীর সেই গুণ্ডাটার হাত ছিঁড়ে যাওয়ার এবং চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আমি এক হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করে বললাম আমায় ছেড়ে দিন। দয়া করে ছেড়ে দিন। আমার কোন খারাপ মতলব নেই।

আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ পড়েছিলাম। চৌকিদার-টা ফিরে এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে মাথায় জলের ছিটে দেয়। চোখ মেলেও প্রথমে আমার মনে হয়েছিল আমি মরেই গেছি। তারপর দেখলাম নিজের দুটো হাত ও দুটো চোখ অক্ষত আছে কিনা। সবই ঠিক আছে। সেই ছেলেটি ও মেয়েটি সেখানে নেই। তাদের কেউ দেখেনি। চৌকিদার জোর দিয়ে বললো রাত্তিরে এখানে কারুর আসার হুকুম নেই।

আমি আজ ভূতে বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় ধারণা ওরা ভূত-টুত নয়—অন্য কিছু। আমাদের জানা জগতের বাইরের কোন অস্তিত্ব। বন্ধুরা অবশ্য সব শুনে বলে, পুরো ব্যাপারটাই আমার চোখের ভুল। নির্জন জায়গায় সম্পূর্ণ একলা থাকলে ঐ রকম নাকি হয়।

দুই নারী

আমার বয়েস তখন একত্রিশ, আমার চুলের বয়েস আঠেরো। তেরো বছর বয়েসে আমার পৈতের সময় শেষবার ন্যাড়া হয়েছিলাম।

ভদ্রলোকের চুলের দিকে আমি আর একবার তাকালাম। চমৎকার কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ওর ফর্সা রঙের সঙ্গে খুব মানিয়েছে। সাধারণ ফিলম্ ষ্টারদের মুখ যেমন মেয়েলি ধরণের হয়। তাপসবাবুর সে রকম নয়—ওঁর মুখে সব সময় একটা পুরুষযোগ্য বিষণ্ণতা।

আমি বললুম, আপনার চুল দেখেই নিশ্চয়ই মেয়েরা আপনার ভক্ত হয়ে যায়?

—হতো একসময়।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোবার চেষ্টা করলেন। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

তাপস রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ ঘাটশীলায়। বাড়ির সকলে মিলে বেড়াতে গেছি সেবার। একদিন বিকেলে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে একটি সুদর্শন যুবককে পায়চারি করতে দেখে আমার বোন বললো—ছোট মাসী দেখো, দেখো, ঐ ভদ্রলোককে ঠিক তাপস কুমারের মতন দেখতে, অবিকল।

ছোট মাসী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো। বোধহয় সত্যিই তাপস কুমার।

মেয়েদের আলোচনা শুনে বুঝলুম, ওদের আলোচ্য জনৈক সিনেমার তাপসকুমার, যিনি পাঁচ বছর আগেও 'দারুণ' পার্ট করতেন, কি 'ভীষণ' নাম ছিল ওঁর। উত্তমকুমারকে কমপিট করতো, কিন্তু হঠাৎ 'বই'তে নামা বন্ধ করে দিয়েছেন, কেন কে জানে! এবং আপাতত প্ল্যাটফর্মে পায়চারিরত ঐ যুবকটিই তিনি না হয়ে যান না!

আমার ছোট বোন বললো, দাদা তুমি আলাপ করে এসো না!

আমি বললাম, ধ্যাৎ!

পরদিন বাজারে মুরগীর ডিম খুঁজে পেলাম না। কেউ কেউ সন্ধান দিল যে রায়বাবুর পোলট্রিতে পাওয়া যেতে পারে। খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে দেখলাম, পোলট্রির মালিক রায়বাবুই গতকাল সন্ধ্যেবেলা দেখা সেই যুবক, অর্থাৎ সত্যিই তাপসকুমার।

সিনেমায় দু'একজন নায়কের নাম কয়েক বছর খুব শোনা যায়। তারপর হঠাৎ তারা অদৃশ্য হয়ে যায়, এমন দেখেছি বটে। তারা কোথায় চলে যায় এতাদন বুঝিনি। কিন্তু তারা ঘাটশীলায় গিয়ে মুরগীর ব্যবসা করে, এটা বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত।

ভদ্রলোকের বয়স সাঁইত্রিশ, স্বাস্থ্য চমৎকার। তবে গলার আওয়াজটা ঘ্যাসঘেসে ধরণের আর ভাঙাভাঙা। এই গলা দিয়ে অভিনয় করা চলে না, আগে নিশ্চয়ই গলার আওয়াজ ভালো ছিল।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল বেশ। আমি ভদ্রতা বশে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অভিনয় ছেড়ে দিলেন কেন?

এর উত্তরে তিনি আমাকে একটা ভূতের গল্প শোনালেন, জানি না, কতদূর সত্যি মিথ্যে।

তাপস কুমার মোট পাঁচখানা ছবিতে নেমেছিলেন। বেশ নাম হয়েছিল, একবার একটা ছবিতে অভিনয়ের জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন। হঠাৎ আরও তিন খানা ছবির কণ্ট্রাক্ট ক্যানসেল করে বিদায় নিলেন চিত্রজগৎ থেকে।

—কেন? সাধারণত কোন নায়িকা হঠাৎ বিয়ে করে ফিলম্ ছেড়ে দেয়। নায়করা তো বুড়ো হয়েও কাকা-জ্যাঠার পার্ট করে। আপনি অসময়ে ছাড়লেন কেন?

—দু'জন নারীর জন্য। ফিলম্-এ নামার আগে থেকেই আমি এদের দু'জনকে খুব ভালোবাসতুম। একজন আমার মা, আর একজনের নাম ছিল গায়েত্রী। দু'জনকেই আমি হারিয়েছি।

—মানে ওঁরা কি······?

—হ্যাঁ, মারা গেছেন। মা ছিলেন আমার ফিলম্-এ নামার ঘোরতর বিরোধী। আর গায়েত্রীর জন্যই আমি প্রথম ফিলম্-এ নায়ক হবার সুযোগ পাই। এরা দু'জনে দু'জনকে একেবারেই পছন্দ করতেন না।

আমি পাড়ার থিয়েটারে পার্ট করতুম। আর গায়েত্রী রেডিওতে নাটক করতো। দু'একটা ফিলম্-এও নেমেছে--অনেক লোকের সঙ্গে চেনাশোনা ছিল। আমি আমাদের পাড়ায় যে-বার 'পথের দাবী' নাটকে সব্যসাচীর পার্ট করি, সেবার গায়েত্রী ফিলম্-এর অনেক লোককে ডেকে এনে দেখিয়েছিল আমার অভিনয়। ওদের মধ্যে ছিলেন সাত্যকি বসু। তিনিই আমাকে ডেকে নিলেন তাঁর পরের ছবির জন্য তা একেবারে হীরোর ভূমিকায়।

—এরকম সুযোগ অনেকেই পায় না।

—তা হলে বুঝতেই পারছেন, গায়েত্রীর প্রতি আমার কতখানি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর আমি ওকে ভালোবাসতুম সত্যি। কিন্তু মা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। মায়ের ধারণা ছিল এই নষ্ট মেয়েটা আমাকে কুপথে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ছিলাম মায়ের এক ছেলে মাকে কোন দুঃখ দেবার কথা আমি ভাবতেই পারতাম না অথচ গায়েত্রী আমার জীবনটা দখল করে নিচ্ছিল।

—এটা একটা সমস্যা বটে।

—সমস্যার সমাধান মা নিজেই করে দিলেন। আমার প্রথম ছবি রিলিজ করার এক মাসের মধ্যেই মা মারা গেলেন। চারিদিকে আমার তখন নাম ছড়াচ্ছে, তার মধ্যে এই দুঃসংবাদ। ইতিমধ্যেই আমি আরও দুটো ছবির কন্ট্রাক্ট পেয়েছি। সাত্যকি বসুর পরের ছবির শুটিং শুরু হবে পনের দিনের মধ্যে।

গণ্ডগোল বাধলো, শ্রাদ্ধের সময় মাথা ন্যাড়া করার ব্যাপারে। গায়েত্রী বললো, খবরদার তুমি মাথার চুল কামিও না। তোমার এমন সুন্দর চুল! স্কুল কলেজের ছেলেরা এর মধ্যেই তোমার

মতন চুল ছাঁটতে শুরু করেছে, এখন ন্যাড়া হলে তোমার ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বামুনকে মূল্য ধরে দাও।

সব দিক ভেবে চিন্তে আমি গায়েত্রীর কথাই মনে নিলাম। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেল। তার বছর খানেকের মধ্যে আমি রীতিমতন বিখ্যাত। গায়েত্রীকে বিয়ে করেছি। বাগবাজার থেকে উঠে গেছি নিউ আলিপুরে। চোখে কালো চশমা পরে ঘুরি।

মায়ের মৃত্যু বার্ষিকীর ঠিক আগের দিন মাকে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নই বলতে হবে, ঠিক যেন মা আমার শিয়রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। খুব দুঃখিত ভাবে বললেন, খোকা তুই ওরকম একটা অনাচার করলি? আমাদের বংশে কেউ এরকম করেনি। তুই বার্ষিকীর দিন মাথাটা এবার ন্যাড়া করে ফ্যাল, নইলে অশৌচ সম্পূর্ণ হয় না।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে আমার মনটা খুব দমে গেল। মায়ের জন্য কষ্ট হতে লাগলো খুব। গায়েত্রী বাপের বাড়ী গিয়েছিল, সকালেই ওকে টেলিফোন করলাম, আমি আজ মাথা কামাবো।

গায়েত্রী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো এ বাড়িতে। তুলকালাম কাণ্ড করলো চেঁচিয়ে। আমার কুসংস্কার নিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলতে লাগলো। সেবারও ন্যাড়া হওয়া হলো না।

তার কয়েকদিন বাদেই আমার সামনের দিকের একগাদা চুল পেকে উঠলো।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাপসবাবুর একটিও চুল পাকা নয়। যাকে বলে ভ্রমরকৃষ্ণ। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

তাপসবাবু আবার বললেন, একত্রিশ বছর বয়সে কি কারুর চুল পাকে না? হয়তো পাকে। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে কারুর মাথায় সমস্ত চুল একেবারে পেকে যেতে দেখেছেন? আমার তাই হলো। তারপরে শীতকালের গাছের আতার মতন রোজ ঝরঝর করে খসে পড়তে লাগলো আমার চুল। গায়েত্রী একদম বিশ্বাস করলো না ব্যাপারটা। ওর ধারণা আমি কোনো ওষুধ-টষুধ মাখিয়ে

এরকম করেছি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয়ে গেলুম। আমার আর চুল ওঠেনি মাথায়।

—কিন্তু আপনার ··?

ভদ্রলোক মাথার চুলগুলো সব তুলে ফেললেন। নিখুঁত পরচুল কিন্তু কী বীভৎস ওর মাথাটা।

—ওখানেই থামে নি। বছর খানেক বাদে হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে গায়েত্রী মারা যায়। তার আগেই আমার ভুরু পাকতে শুরু করে। এখন ভুরু দুটোও নকল।

আমি বললাম, এ তো এক ধরণের অসুখ। চামড়ার অসুখ। আপনি চিকিৎসা করান নি?

—চূড়ান্ত করেছি। যতদূর চিকিৎসা সম্ভব। শুনুননা, এরপর শুরু হলো আরেক জনের প্রতিশোধ মরে যাবার অল্প কয়েকদিন পরেই স্বপ্নে দেখা দিল গায়েত্রী। দারুণ ক্রুদ্ধ চেহারা। কি বললে জানেন?

—আমি কি করে জানবো?

—বললে, মায়ের জন্য তুমি এমন সুন্দর চুল নষ্ট করলে, আমার জন্য কিছু ত্যাগ করবে না? আমি বুঝি তোমার কেউ নই? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি দেব তোমাকে? গায়েত্রী আমার গলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখলো। মনে পড়লো, গায়েত্রী আমার গলার আওয়াজ সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতো। নিজের গলার আওয়াজ আমি কি করে ত্যাগ করি, বলুন? কিন্তু গায়েত্রী রোজ স্বপ্নে ভয় দেখাতে লাগলো। ওর জন্য ফিলম্ থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ করলাম। তবু নিস্কৃতি নেই।

ভদ্রলোক হঠাৎ খুব কাশতে লাগলেন। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগলো।

আমি বললাম, এ তো নিশ্চয়ই মানসিক অসুখ। আপনাকে মানতেই হবে, অ্যানালিসিস করলে······

—মানসিক। শুধু মানসিক? গায়েত্রী জোর করে আমার

গলা বন্ধ করতে চেয়েছিল। এই দেখুন।

তাপসবাবু মাফলার খুললেন। তাঁর গলায় তিনটে লাল দাগ। স্বপ্নের মধ্যে নিজেই নিজের গলা টিপে ধরেননি তো? ভদ্রলোক নিজে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সুতরাং আমার কোন উপদেশ দেওয়া মানায় না। আমি চুপ করে রইলাম।

তাপসবাবু এমন কাশতে শুরু করলেন যে এরপর কথা বলাই মুস্কিল হয়ে দাড়ালো। কোন রকমে ফ্যাসফ্যাস করে বললেন, সবটা গলার আওযাজ নিয়ে নেবে। সবটা? তার আগে থামবে না।

তাপসবাবুকে বিশ্রাম নিতে বলে আমি উঠে চলে এলাম।

পরের বছর খবর পেয়েছিলাম, উনি গলার ক্যানসার অসুখে মারা গেছেন।

নিয়া সুপথ

রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

সেই জন্যই রাস্তাঘাট এর মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে। লাস্ট বাস থেকে নামবার সময়ই আমার পা-টা মচকে গেল।

বেশী রাত্রির বাস এমনিতেই ঝড়ের বেগে ছোটে। কোথাও বেশী-ক্ষণ থামতেই চায় না। যাত্রী খুব কম টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে আমিই একমাত্র নামবো। দরজার কাছে হাতল ধরে দাঁড়ানো মাত্র কণ্ডাকটর গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিয়ে দিল। চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হলো।

হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেতাম। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছি। কিন্তু বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে বেশ চোট লেগেছে। একটু হাঁটতে গিয়ে বুঝলাম রীতিমতন ব্যথা।

এই সময় একটা রিক্শা পেলে ভালো হতো। অন্যদিন অনেক রিক্শা থাকে এখানে। আজ বৃষ্টির জন্য রাস্তা ফাঁকা, তাই রিক্শাও

নেই। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টির মধ্যে এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে হবে।

দু'একটা রিক্‌শা ফুটপাতের ওপর তুলে রেখে তাদের চালকরা ঘুমোচ্ছে। ডেকে তুললে অনেক সময় ওরা যেতে চায় না! মেজাজ দেখায়। কি করবো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। এই সময় পেছনে ঠুং ঠুং শব্দ কানে এলো। একটা ফাঁকা রিক্‌শা। বুড়ো মতন একজন লোক সেটা চালাচ্ছে। মাথার ওপরে এক টুকরো প্লাষ্টিক টুপীর মতন পরে আছে। সে নিজেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবু যাবেন?

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। কোনো দরাদরি না করে উঠে বসলাম। মেজাজটা আবার একটু প্রসন্ন হতে একটা সিগারেট ধরালাম।

বড় রাস্তা থেকে আমার বাড়ি মিনিট সাতেকের পথ। সেখানে পৌঁছবার পর আমি নেমে পড়ে রিক্‌শাওয়ালাকে একটা টাক দিলাম।

সে বেশ খুশীই হয়েছে মনে হলো। অনেকখানি ঝুঁকে সেলাম করলো। তারপর যখন আবার সোজা হলো, তার মুখখানা দেখে আমি দারুণ চমকে উঠলাম।

কেন চমকালাম তা নিজেই জানি না। খুব সাধারণ চেহারার একজন বুড়ো। মুখে অল্প অল্প দাড়ি। খুব একটা খারাপ দেখতেও নয়! তবু চমকে ওঠার কারণ কী! কিছুই বুঝতে পারলাম না।

শুধু বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগলো।

ভেতরে এসে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়েও মনের মধ্যে খচখচানিটা রয়েছে। লোকটার মুখে চোখে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবু হঠাৎ ওকে দেখেই আমার গা-টা কেঁপে উঠেছিল কেন?

জামা কাপড় ছেড়ে, আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর মনে পড়লো। এই রিক্‌শাওয়ালাটার সঙ্গে আর একটা লোকের দারুণ মিল আছে।

বছর দেড়েক আগে সমস্তিপুর থেকে ফিরছিলাম একবার। একাই। স্টেশনে হকারদের কাছ থেকে দুটো ডিমসেদ্ধ আর তিন পাতা আলুর দম খেয়েছিলাম। ট্রেন ছাড়ার আধঘণ্টার মধ্যেই আমার অসম্ভব পেট ব্যথা শুরু হলো। তিনবার বমি করলাম। কিছুতেই পেট ব্যথা কমে না। বাথরুমের বাইরে দরজার কাছে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম একবার—মনে হলো আমার কলেরা হয়েছে, আমি এক্ষুণি মরে যাবো।

হয়তো মরেই যেতাম। সেই সময় ভিড় ঠেলেঠুলে একজন বিহারী ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? দেখি জিভ দেখি আপনার—

ভদ্রলোক ডাক্তার। সঙ্গে তার ওষুধের বাক্স। তিনি আমাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন এক জায়গায়। তারপর এমন সেবা করতে লাগলেন যে অনেক নিকট আত্মীয়ও সে রকম পারে না।

তাঁর ওষুধে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার পেট ব্যথা কমে গেল। আর একটা ওষুধে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সেই ডাক্তার ভদ্রলোককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পাই নি। ঘুম ভাঙার পর আর দেখতে পাইনি তাঁকে। অন্য লোকজনের মুখে শুনলাম তিনি বারাউনিতে নেমে গেছেন। দারুণ আপসোস হয়েছিল। আমার সেই উপকারী বন্ধুর নামটাও জানতে পারি নি। মুখটা অবশ্য মনে আছে। মধ্যবয়স্ক লোক। মুখে অল্প অল্প দাড়ি। অবিকল আজকের রিকশাওয়ালার মতন। এ কখনো হয়? মানুষে মানুষে এত মিল থাকে; যমজ ভাই হলে অনেক সময় হতেও পারে। কিন্তু একজন ডাক্তার আর একজন রিক্শাওয়ালা? সেই ডাক্তারই কোনো রকম ভাগ্য বিপর্যয়ে রিক্শাওয়ালা হয়েছে? তাহলে তো আমার উচিত ব্যাপারটার খোঁজ করা। কিম্বা যদি ডাক্তারের ভাইও—হয়—!

পরদিন পায়ে এমন ব্যথা হলো যে বাড়ি থেকে বেরুতেই

পারলাম না। আমার ছোট ভাই-ই ডাক্তার। সে আমার হাঁটাচলা একদম বন্ধ করে দিল। সাতদিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েই সেই রিক্‌শাওয়ালার খোঁজ করেছিলাম। পেলাম না। অন্য দু' একজন রিক্‌শাওয়ালাকে তার কথা জিজ্ঞেস করেও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশ্য এত সামান্য বর্ণনায় কোনো মানুষকে খুঁজে বার করাও যায় না। মধ্যবয়স্ক এবং মুখে সামান্য দাড়িওয়ালা আরও দু'তিনজন বিহারী রিক্‌শাওয়ালা আছে। কিন্তু কেউই সেই লোকটি নয়। হতে পারে। সেই রিক্‌শাওয়ালা অন্য পাড়ার। সেদিনই শুধু এদিকে এসে পড়েছিল।

তবু মনের মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেল। আমার দু' দু'বার বিপদের সময় ঠিক একই রকম চেহারায় দুজন লোক আমাকে সাহায্য করার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছিল! এ কেমন করে হয়।

বন্ধুবান্ধবদের বললাম ঘটনাটা। তারা হেসে উড়িয়ে দিল কয়েকজন নানারকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলে। মাঝ রাত্তিরে অন্ধকারে আমি রিক্‌শাওয়ালার মুখ ভালো করে দেখতে পাইনি। আমার অচেতন মনে নাকি সেই সময়েই সেই ডাক্তারটির কথা ঘুরছিল সেই জন্যই নাকি আমি রিক্‌শাওয়ালার মুখখানা সেই ডাক্তারের মতন কল্পনা করে নিয়েছি! কি জানি হতেও পারে!

এর ঠিক বছর দেড়েক বাদে আর একটা ঘটনা ঘটলো। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম ট্যাক্‌সি করে। আমার সঙ্গে অনেক কাগজ পত্র। খুব মন দিয়ে আমি কয়েকটা চিঠিপত্র পড়ছিলাম—এবং যেগুলো অপ্রয়োজনীয় সেগুলো ফেলে দিচ্ছিলাম জানালা দিয়ে। এক সময় দেখলাম, ঠিক আমার জানালার পাশেই একটা ট্যাক্‌সি জোরে হর্ণ দিচ্ছে এবং পেছনের সীট থেকে একজন লোক হাত পা নেড়ে আমাকে কী যেন বলতে চাইছে। লোকটির মুখে খুব একটা ব্যস্ত ভাব। আমি আমার ট্যাক্‌সি ড্রাইভারকে বললাম রোখকে। রোখকে!

পাশাপাশি দুটো ট্যাক্‌সিই দাঁড়িয়ে গেল। অন্য ট্যাক্‌সির

একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনার চিঠিপত্র যে সব উড়ে যাচ্ছে। আমি দুটো কুড়িয়ে এনেছি—

আমি অবহেলার সঙ্গে বললাম, ওগুলো তো আমি ফেলে দিয়েছি! কেন মিছিমিছি আপনি তুলতে গেলেন।

পরক্ষণেই মনে হলো, যাই হোক ভদ্রলোক এরকম কষ্ট করেছেন যখন, ওঁকে একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত অন্তত!

কিন্তু ধন্যবাদ জানাবার আগেই দুটি ব্যাপারে আমাকে চমকে উঠতে হলো। আমার ট্যাক্সিটা থেমে পড়ায় পেছনের গাড়িটা ওভারটেক করে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিনিবাসের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো। এত জোর অ্যাক্সিডেন্ট যে আওয়াজে প্রথমে কানে তালা লেগে যাবার মতো হলো। এবং সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করলাম। আমার পাশের ট্যাকসির ভদ্রলোকের মুখখানা অবিকল সেই ট্রেনের ডাক্তার কিংবা মাঝ রাত্তিরের রিক্‌শা-ওয়ালার মতন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্‌সি থেকে নেমে পড়লাম। এখন ঠিক বিকেল, এখন তো চোখের ভুল হবার কথা নয়!

সামনের অ্যাক্‌সিডেন্ট দেখতে বহুলোক ছুটে যাচ্ছে। গাড়িটার ক্ষতিই হয়েছে বেশী, পেছনের দু'জন যাত্রীর অবস্থা সঙ্গীন। দৃঢ় ধারণা হলো, আমার ট্যাক্‌সিটা যদি এভাবে না থামাতো, তাহলে এটা নিশ্চয়ই অ্যাক্‌সিডেন্ট করতো এবং এতক্ষণে আমার ছিন্নভিন্ন শরীর পড়ে থাকতো রাস্তায়। এই ভদ্রলোকই আমাকে বাঁচিয়েছেন।

আমি অন্য ট্যাক্‌সির জানালার ধারে গিয়ে বললাম। আপনি আমার আজ যে কী উপকার করলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না! কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।

ভদ্রলোক সামনের অ্যাক্‌সিডেন্টটা দেখে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। ফিসফিস করে বললেন, ওরেঃ বাবা! কী সাংঘাতিক অ্যাক্‌সিডেন্ট! কেউ মারা গেছেন নিশ্চয়ই!

এই সুযোগে আমি ভদ্রলোককে ভালো করে দেখে নিলাম।

মধ্যবয়স্ক, মুখে অল্প দাড়ি। খুব লম্বা কিম্বা বেঁটে নন। সব কিছু সেই ট্রেনের ডাক্তারটির মতন এক রকম।

আমি বললাম, আপনি এখানে একটু নামবেন?

উনি বললেন, আমার বিশেষ জরুরী কাজ ছিল—

—কিন্তু এখন তো যেতে পারবেন না। রাস্তা জ্যাম হয়ে গেছে।

—তাই তো, কি যে করি!

ট্যাক সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উনি নেমে পড়লেন। আমি বললাম, আজ আপনিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!

উনি লজ্জিত ভাবে বললেন, না, না, আমি আবার কী করলাম! আপনার চিঠিগুলো উড়ে উড়ে পড়ছিল। যদি কাজের জিনিস হয়, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি।

—কিন্তু আপনি ঐ জন্য আমার ট্যাক্‌সিটা না থামালে আমিই ঐ অ্যাক্‌সিডেণ্টে পড়তাম নির্ঘাত।

—কলকাতার রাস্তায় কখন যে কার অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে তা বলা যায় না!

সামনেই গাড়ি থেকে তখন একটা মৃতদেহ নামানো হচ্ছে। ভদ্রলোক মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ইস, এইসব দৃশ্য আমি একদম দেখতে পারি না!

আমি বললাম, চলুন, কোন দোকানে বসে একটু চা খাই।

উনি বললেন, আমার বড় জরুরী কাজ ছিল—কিন্তু কী আর হবে।

আমার অনুরোধে ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। আমি তখন কৌতুকহলে ছটফট করছি। ভদ্রলোককে বাঙালী বলেই মনে হচ্ছে। যদিও অনেক বিহারী পরিস্কার বাংলা বলতে পারেন।

নিজের নামটা বলে, ওঁকে নাম জিজ্ঞেস করলাম।

উনি বললেন, আমার নাম কৃষ্ণচন্দ্র হালদার।

খাঁটি বাংলা নাম। তবু চেহারার এত অসম্ভব মিল কী করে হয়? রিক্‌শাওয়ালাকে আমি ভালো করে না দেখলেও ট্রেনের সেই

ডাক্তারের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। হুবহু এই রকম।

—আপনি কি ডাক্তার?

—না তো!

—আপনি কি সমস্তিপুরের দিকে কখনো গিয়েছিলেন?

—সমস্তপুর? না যাইনি কখনও!

ভদ্রলোক রীতমতন অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন একথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

—ঠিক অবিকল আপনার মতন চেহারার একজন লোককে আমি আগে দেখেছি। একজন নয় দু'জন।

কৃষ্ণচন্দ্র হালদার হাসতে আরম্ভ করলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, সে কি মশাই। ঠিক আমার মতন চেহারা? তা হয় নাকি!

—আপনার কোনো ভাইটাই।

—আমার তো কোনো ভাই নেই।

কিছুতেই কিছু মিলছে না। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঠিক এই রকম চেহারার দু'জন লোককে আমি দেখেছি। প্রত্যেকবারই আমার কোনো বিপদের সময়।

কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। ট্রেনের সেই ডাক্তারটিকে আমি কিছুই শোধ দিতে পারিনি। এই ভদ্রলোকও আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। এঁকে কিছুটা অন্তত খাতির করা উচিত।

—কী খাবেন বলুন?

ভদ্রলোক কিছুই খেতে চান না। শুধু এক কাপ চা। তা হয় না। আমি শেষ পর্যন্ত দু'প্লেট স্যাণ্ডউইচ আর চায়ের অর্ডার দিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, উঃ এই রকম সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেণ্ট, এখনো আমার শরীরটা কাঁপছে!

—অ্যাক্সিডেণ্টে আমার মরার কথা ছিল।

—বলবেন না মশাই, ও কথা বলবেন না। আমি এই দৃশ্য একদম সইতে পারি না!

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। তাতে একটি মাত্র সিগারেট।

সেটাই বাড়িয়ে দিলাম ভদ্রলোকের দিকে। তিনি নিতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, একটা রয়েছে। আপনার?

— আবার আনিয়ে নিচ্ছি।

—দাঁড়ান, আমি সিগারেট কিনে আনছি।

—না, না, আপনি বসুন, আমি আনাচ্ছি।

—আমার নিজেরই কেনা দরকার। অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গেছে।

—বেয়ারাকে পাঠালেই তো—

ভদ্রলোক সে কথা শুনলেন না। নিজেই সিগারেট কিনতে বেরিয়ে গেলেন। আমি আমার হাতের কাগজ পত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগলাম। ভাগ্যিস বাজে চিঠিগুলো জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলোম।

বেয়ারা এসে চা আর স্যাণ্ডউইচ রেখে গেল। ভদ্রলোক তো সিগারেট কিনে ফিরলেন না। দোকানের পাশেই তো সিগারেটের দোকান। হয়তো টাকার খুচরে পাচ্ছেন না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ভদ্রলোক এলেন না। এত দেরী হবার তো কোনো কথাই নয়। উঠে গিয়ে দরজার বাইরে উঁকি দিলাম। সিগারেটের দোকানের সামনে সেই ভদ্রলোক নেই।

সেখানে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুখে দাড়িওয়ালা একজন লোক এসেছিলেন একটু আগে।

দোকানদার বললো, না তো!

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ভদ্রলোককে আর পাওয়া গেল না। সেই দু'প্লেট স্যাণ্ডউইচ আর চা আমাকে একলাই শেষ করতে হলো।

ভদ্রলোক চলে গেলেন কেন? হয়তো খুব জরুরী কোনো

কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। জরুরী কাজের কথা তো বলছিলেনই কাজেই আর একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে পড়েছেন।

কিন্তু আমাকে একবার বলেও গেলেন না?

মনের মধ্যে খটকাটা রয়েই গেল।

ঘুম জাগরণ

এক সময়ে যে এখানে একটা বেশ বড় নদী ছিল, তা এখনো বোঝা যায়, যদিও নদীর চিহ্ন বিশেষ নেই। অনেকখানি ঢালু খাত, সেখানে এখন সর্ষের চাষ হচ্ছে, হাওয়ায় দুলছে অজস্র সর্ষে ফুল।

তাপস হাত বাড়িয়ে বললো, এইখান থেকে ওই পর্যন্ত নদীটা চওড়া ছিল, বুঝতে পারছিস? ওই যে ওপাশের অশ্বত্থ গাছটা, তার ধার পর্যন্ত।

ঢালু জমি দেখে অনুমান করা যায়। তবে জল নেই কোথাও। এরকম মরা নদী আমি আগে কখনো দেখিনি। কি রকম যেন একটু দুঃখ হতে লাগলো। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, নদীটা এরকমভাবে মরে গেল কি করে?

তাপস বললো, কত নদীই তো মরে যায়। অনেক নদী দিক পাল্টায়। এটাও সে রকমই।

—বর্ষাকালেও জল হয় না?

—হয় একটু একটু। সে তো পুকুর বা খানা ডোবাও বৃষ্টির জলে ভরে যায়। কিন্তু এটার আর স্রোত নেই। দুদিন বাদে মাটি ভরাট হয়ে গেলে সেটুকু জলও জমবে না।

দূরের মাঠে কয়েকজন চাষীকে দেখা যায়। এ ছাড়া আশেপাশে আর লোকালয় নেই। আছে শুধু একটা বিরাট বাড়ি। প্রাসাদই বলা যায়।

বাড়িটার বয়েসও বেশী না। সত্তর আশি হবে বড় জোর। মানুষের পক্ষে এই বয়েসটা যথেষ্ট হলেও একটা বাড়ির পক্ষে কিছু না। এখনো বেশ শক্ত সমর্থ আছে। প্রত্যেক ঘরের জানালায় নীল কাচ বসানো হয়েছিল তৈরির সময়, তার মধ্যে অনেক কাচ আজও অক্ষত।

বাড়িটা তৈরি করেছিলেন তাপসের ঠাকুরদার বাবা। শৌখিন লোক ছিলেন তিনি। তখন এখানে নদী ছিল জ্যান্ত, প্রকৃতি ছিল সুন্দর। নদীর পাড়ে বসিয়েছিলেন বিশ্রাম ভবন। শুধু বিশ্রামের জন্য এত বড় বাড়ি না বানালেও চলতো। কিন্তু তখনকার দিনের লোকেরা ছোট কিছু বানাতেই পারতেন না। তাছাড়া ওঁদের টাকা পয়সাও ছিল যথেষ্ট।

এই সুন্দর অট্টালিকাটিরও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। নদী শুকিয়ে গেছে। লোকালয় সরে গেছে। এখন এই মাঠের মধ্যে বাড়িটাকে বেখাপ্পা দেখায়। সেই আসল জমিদার নেই, তাপসদের অবস্থাও আগেকার মতো নয়। এতবড় বিশ্রাম ভবন ওদের কাজে লাগে না।

এত বড় একটা বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করাও যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। সারা বছর ওদের পরিবারের প্রায় কেউই আসে না এখানে—শুধু শুধু বাড়িটাকে টিকিয়ে রাখার আর যুক্তি নেই।

বাড়িটাকে আর কোনো কাজেও লাগানো যাচ্ছে না। এখানে কেউ এতবড় বাড়ি ভাড়া নেবে না। রেল ষ্টেশন বেশ দূরে বলে মিল ফ্যাকটারি করার পক্ষেও অনুপযোগী।

তাপসরা চেয়েছিল বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দিতে। সরকারও উৎসাহী হয়নি।

এই জনমানবহীন জায়গায় বাড়িটাকে ইস্কুল কলেজ বা হাসপাতাল করারও কোনো মানে হয় না। কাছাকাছি কোনো বড় রাস্তা বা বাসরুট পর্যন্ত নেই। বাড়িটা বিক্রির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি, তাপসরা তাই বিরক্ত হয়ে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলবে ঠিক করেছে। অন্তত জানালা দরজা আর

কিছু ইট বিক্রি হবে। অর্থাৎ একেবারে নষ্টই হবে সব কিছু।

আগামী মাসেই তিন তারিখে নিলাম হবে জানালা দরজা। শেষবারের মত তাপস তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে এসেছে কয়েক-দিনের জন্য। সেই টানে টানে আমিও উপস্থিত।

এত বড একটা বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে শুনলে কার না মন খারাপ হয়। বাড়িটা যে দেখতে সুন্দর, শুধু সেই কারণেই যেন এর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এখন সব কিছুই বিচার হয় প্রয়োজনের মাপ কাঠিতে। আমার বারবার মনে হতে লাগলো, আমার যদি টাকা থাকতো, আমি ঠিক কিনে নিতাম এ বাড়িটা! তারপর কি করতাম? কিছুই না। এমনি থাকতো। তাপস আর মিলি ঘুরে ঘুরে দেখালো আমাকে সারা বাড়িটা। শুধু দোতলা আর তিন তলাতেই চোদ্দখানা ঘর। এ ছাড়া বিরাট বারান্দা, মোটা মোটা থাম আর লিখান। একতলায় ঘরগুলি রাখা হয়েছিল শুধু চাকর-বাকরদের জন্য। এখন অবশ্য একটি মাত্র চাকর ও একজন দারোয়ান থাকে। বাড়ির সব কটা ঘর খোলাই হয়নি বহুদিন।

আমরা আশ্রয় নিয়েছি দোতলার দক্ষিণ কোণের দিকে পাশাপাশি দুটি ঘরে। আরও অনেক বন্ধু-বান্ধব এলে বেশ জমজমাট হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। দু'একজন আসবে বলেও আসতে পারেনি।

দিনের বেলাটা অবশ্য আমাদের ভালোই কাটে। অল্প অল্প শীত পড়েছে। দোতলার বিশাল বারান্দায় রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। দুপুর বেলা একটা লম্বা ঘুম দিই। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়।

সন্ধ্যের পর আর ঠিক মতো আড্ডা হতে চায় না শহরের কোনো বাড়িতে তিনজন নারী পুরুষের আড্ডা দিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এখানে এই প্রকাণ্ড নির্জনতার মধ্যে আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী, খুবই অকিঞ্চিৎকর লাগে নিজেদের। একতলায় চাকর দারোয়ানদের

অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কোন কিছুর দরকার হলে চিৎকার করে ডাকতে হয়।

ইলেকট্রিক নেই, সন্ধ্যের পরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুটো হ্যাজাক জ্বেলেও সেই অন্ধকারে বেশী ফাটল ধরানো যায় না। তাপস সঙ্গে ট্রানজিস্টার রেডিও আর টেপ রেকর্ডার এনেছে—তাতে গান শোনা হয় সন্ধ্যের পর। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনতেও একঘেয়ে লাগে। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাপস হুইস্কির বোতল বার করে।

তাতে আবার মিলির আপত্তি। মদ্যপান বিষয়েই যে মিলির কোনো আপত্তি আছে তা নয়। কিন্তু ও বলে তোমরা তো বসে বসে এখন মদ খাবে। আর আমি একা একা কি করবো? দু'জন মদ্যপায়ীর সঙ্গে তৃতীয় কারুর গল্প যে বেশীক্ষণ জমে না সে কথাও ঠিক।

মিলিকেও একটু হুইস্কি খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু গন্ধটা ওর কিছুতেই সহ্য হয় না। বমি আসে। একবার কোন্ পার্টিতে সে একটু শেরি খেয়েছিল, সেটা তার খুব ভালো লেগে ছিল। সে শেরি খেতে চায়। কিন্তু শেরি কোথায় পাওয়া যাবে।

চার বছর আগে বিয়ে হয়েছে। মিলির এখনো ছেলেমেয়ে হয়নি। সে সব সময় সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। এখানে দেখবার কেউ নেই, তবু সে বিকেল বেলা স্নান করে খুব সাজগোজ করে এসে বসে আমাদের সঙ্গে। টেপ রেকর্ডারে গান বাজায়। সেই আসরে তাপস গেলাসে হুইস্কি ঢালতেই মিলি অমনি বলে, এই আবার শুরু হলো তো তোমাদের। তারপর রাত্তিরবেলা একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়, হাজার ডাকলেও উঠবে না।

তাপসের শরীরে এখনো জমিদারি রক্ত। সে বউকে ভয় পায় না। মিলির আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই সে হুইস্কির বোতল খোলে। আমারই বরং একটু সঙ্কোচ লাগে।

তৃতীয় রাত্রে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ বাড়িতে ভূত-টুত নেই।

তাপস হেসে উঠে বললো, ভূত? তুই আবার ভূতে বিশ্বাস করতে শুরু করলি কবে থেকে?

আমি বললাম, তা নয়, মানে, খুব পুরোনো বাড়ি তো। এই সব বাড়ি সম্পর্কে সাধারণতঃ অনেক রকম গল্প থাকে।

তাপস বললো, খুবই দুঃখের বিষয়, সে রকম কোনো গল্প তোকে শোনাতে পারছি না। এ বাড়িতে কেউ কোনোদিন কিছু দেখে নি। আগে যখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল, তখন অনেক সময় তিরিশ চল্লিশজন লোক একসঙ্গে বেড়াতে এসেছে, সব কটা ঘর খোলা হতো, কেউ কিছু দেখে নি।

—চাকর বাকররাও কিছু দেখে নি?

—শুনি নি কখনো। কেন, তুই বুঝি গল্পের খোরাক খুঁজছিস?

মিলি চুপ করে শুনছিল। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ ভূতের কথা মনে হলো কেন আপনার?

আমি বললাম, ভূত-টুত থাকলে আমাদের আরও কয়েকজন সঙ্গী বাড়তো। আমরা যে রকম সঙ্গীর অভাব বোধ করছি—

—আপনি ভূতের ভয় পান না?

—রাত্তিরবেলা একটু একটু পাই, দিনের বেলা পাই না। তবে, আজকালকার ভূতেরা তো খুব ভদ্র হয়। ভয়-টয় বিশেষ দেখায় না।

মিলি একটু চুপ করে থেকে বললো, ভূত আছে কিনা জানি না। তবে, আমার মনে হয়, এ বাড়িটাতে একটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার আছে।

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠে বললাম, তার মানে? আপনার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

—হ্যাঁ হয়েছে।

—কি, কি শুনছি? আগে বলেন নি তো? এইবারই হয়েছে না অন্যবার।

—যতবার এ বাড়িতে এসেছি ততবারই হয়েছে। ব্যাপারটা

আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। আমার মনে হয়, আমায় যেন কেউ ডাকে।

তাপস বললো, ননসেন্স।

মিলি দুঃখিতভাবে বললো, তুমি তো আমার সব ব্যাপারই ননসেন্স বলো।

আমি তাপসকে বাধা দিয়ে বললাম, দাঁড়া না, ব্যাপারটা শুনতে দে না!

তাপস বললো, ব্যাপারটা আর কিছুই না। মিলির একটা অসুখ আছে। সোমনামবুলিজম্ কাকে বলে জানিস তো? ঘুমের মধ্যে ঘোরের মাথায় ঘুরে বেড়ানো। সোজা বাংলায় স্লিপ ওয়াকিং যাকে বলে। মিলি এই রকম হঠাৎ হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে হেঁটে বেড়ায়।

মিলি বললো, মোটেই আমার সে রকম কোনো অসুখ নেই।

তাপস বললো, বাঃ তোমার দাদা সেবার বলেন নি যে ছেলেবেলায় তুমি এরকম কয়েকবার বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিলে পর্যন্ত।

—সে তো খুব ছেলেবেলায়।

– আবার সেটা দেখা দিয়েছে।

—কিন্তু এ বাড়িতে এলেই সে রকম হয় কেন?

—মনের জোর আনো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি মিলিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কেউ ডাকে তার মানে কি? কারুকে চোখে দেখতে পান?

মিলিকে কোনো কথাই বলতে দিল না তাপস। বিরক্তভাবে বললো, থাক্, ও কথা থাক্, ওসব আজেবাজে কথা আমার ভালো লাগে না।

বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তাপস ঘোরতর নাস্তিক। ভগবান কিম্বা ভূত কোনোটাই সে গ্রাহ্য করে না। মিলি হঠাৎ চলে গেল ঘরের মধ্যে। বুঝলাম সে রাগ করেছে।

ঘটনাটা ঘটলো সেই রাত্রেই। মিলি চলে যাবার পর তাপস

আর আমি আরও অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তাপস বোতলটা পুরোই শেষ করতে চায়। চাকর এসে দু'একবার জিজ্ঞেস করেছে খাবার দেবে কিনা, তাপস তাকে ধমকে ফিরিয়ে দিল। বোতলটা শেষ হবার পর তাপস বেশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। আমি কম্ খেয়েছিলাম। তাপস সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কোনোক্রমে তাকে ধরা-ধরি করে এনে বসালাম খাবার টেবিলে। কিন্তু খাদ্যে তার আর রুচি নেই। সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে লাগলো।

খাবারের টেবিলে মিলি আগাগোড়া খুব গম্ভীর। আমি একটু অপরাধী বোধ করতে লাগলাম। মিলি বোধ হয় ভাবলো আমিই ওর স্বামীকে মাতাল করে দিয়েছি। সকলেই এরকম ভাবে।

খাওয়া শেষ করে আমি উঠে পড়লাম। তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, তোকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসবো ?

মিলি বললো, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। আপনার যাবার দরকার নেই।

আমি নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে বই পড়া আমার অভ্যাস। কিন্তু হ্যাজাকের আলায় বই পড়তে বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। আলো নিভিয়ে দিতেই চতুর্দিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। কেন ঘুম ভাঙলো জানি না। ঘুম ভাঙ্গাও দু'রকম হয়। কখনো কখনো ঘুমটা একটু চিরে যায়, অস্পষ্ট জাগরণের অনুভূতি, কিন্তু চোখ মেলতে ইচ্ছে করে না। আবার কখনো হঠাৎ সম্পূর্ণ ঘুম ভেঙে যায়, চোখ দুটো খুলে যায় সম্পূর্ণ ভাবে। আমার দ্বিতীয় রকম হলো, চোখ মেলার পর কোনো চিন্তা না করেই আমি খাট থেকে নেমে এলাম। তারপর দেখলাম আমার ঘরের দরজা খোলা।

এজন্য কোনো খটকা লাগলো না। ঘরের দরজা আমি নিজেই বন্ধ করিনি হয়তো। কিংবা ভেজানো ছিল, হাওয়ায় খুলে গেছে। এখানে চুরি-টুরির ভয় নেই, দরজা বন্ধ করার সতর্কতারও দরকার হয় না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। পাশেই তাপসদের ঘরের দরজা বন্ধ। আমার ডান পাশে বিরাট লম্বা বারান্দায় পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম বারান্দা দিয়ে। কেন এগোচ্ছি তা আমি জানি না। এবং বেশ জোরে জোরেই হাঁটছি আমি। সারা বাড়িটা একেবারে নিঃশব্দ, সূচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। আমি শুনতে পাচ্ছি শুধু আমার পায়ের আওয়াজ।

বারান্দার একপাশে সিঁড়ি। কোনো কিছু না ভেবেই আমি তিনতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলাম। তিনতলাতেও সমান লম্বা বারান্দা। ঘরগুলিতে সব তালা বন্ধ। পুরো বারান্দাটা পার হয়ে আমি চলে এলাম আর এক কোণে। এখানে রয়েছে একটা ঝুল বারান্দা।

সেই ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। আমার দিকে পেছন ফেরা। পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে একরাশ চুল। মেয়েটির হাতে একটা মোমবাতি, হাওয়ায় তার শিখাটা অল্প অল্প কাঁপছে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

এই প্রথম আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। আমি এখানে এলাম কেন? এই মেয়েটি কে?

আমার পায়ের শব্দ শুনেই বোধহয় মেয়েটি ফিরে তাকালো। মিলি! আমাকে দেখে সে কিন্তু একটুও চমকে উঠলো না। একটু হেসে বললো, আসুন। এত দেরী করলেন যে।

আমার গলাটা শুকনো লাগলো। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। মিলি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললো, আসুন। দেখবেন না?

এবার আমি শুকনোভাবে বললাম, কি দেখবো?

—এদিকে আসুন।

মিলি আমার হাত ধরে এনে পাঁচিলের কোণে দাঁড় করালো। তারপর বললো, সামনে তাকিয়ে দেখুন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে

আছি ! আমি ভাবছিলাম, আপনি আরো আগে আসবেন।

সামনের মাঠ অল্প জ্যোৎস্নায় আবছা ভাবে দেখা যায়। আমি সেদিকে তাকালাম।

মিলি বললো, দেখেছেন নদীতে কত জল? নদীটা আবার বেঁচে উঠেছে। আবার এখানে মানুষজন আসবে। এ বাড়ি ভাঙা হবে না।

সামনে তাকিয়ে মনে হলো, সত্যিই নদীটা যেন জলে ভর্তি। জলের ওপর ঢেউ খেলা করছে জ্যোৎস্নায়।

আমি বললাম, বাঃ কি সুন্দর।

আপনাকে আমি বলেছিলাম না? এখন দেখলেন তো? বিশ্বাস হলো তো?

একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই বুঝতে পারলাম, সব কিছুই চোখের ভ্রম। নদীর শুকনো গর্ভে সর্ষের খেত, এই জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখাচ্ছে।

মিলি বললো, এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না?

আমি বললাম, মিলি, ঘরে চলুন।

মিলি চাপা গলায় বললো, না। আমি যাবো না। আপনি আমার সঙ্গে এখানে থাকবেন না সুনীলদা?

—এখানে কতক্ষণ থাকবেন?

—যতক্ষণ ইচ্ছে।

—না ঘরে চলুন।

আমি মিলির বাহুতে হাত ছোঁয়াতেই সে আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। কি রকম যেন আনন্দ ভাব। চোখ দুটো বোজা। আমি ওর হাত ধরে টেনে আনলাম। মিলি আর কোনো আপত্তি করলো না।

দোতলায় নেমে আসতেই মিলি আমার হাত ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললো, আপনি আর আমি ছাড়া নদীটাকে কেউ দেখে নি।

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মিলি দ্রুত হেঁটে চলে গেল নিজের ঘরে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হলো। চোখ মেলার পরেই ভাবলাম, গতকাল রাত্রের ব্যাপারটা কি সত্যি? নাকি আমি স্বপ্ন দেখেছি? একবার মনে হচ্ছে স্বপ্ন, আবার মনে হচ্ছে সত্যি।

আমি উঠে চলে এলাম তিনতলায়। সেই ঝুল বারান্দায় এসে মনে হলো, হ্যাঁ, কাল রাত্রে আমি এখানে এসেছিলাম ঠিকই। একটা মোমবাতির টুকরো পড়ে আছে। মিলিও কাল রাত্রে এসেছিল এখানে।

সকালবেলা মিলির চেহারা একেবারে অন্যরকম। স্নান করে নিয়েছে। তাপসের সঙ্গে কি একটা কথায় হাসছে খুব। বুঝলাম ওদের ঝগড়া মিটে গেছে।

গত রাত্রের ব্যাপারটা মিলি একবারও উল্লেখ করলো না। আমার সঙ্গে ব্যবহারেরও কোনো আড়ষ্টতা নেই। সারাদিন ধরে আমি লক্ষ্য করলাম মিলিকে। ওকি কাল রাত্তিরের ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে? ও কিছু বললো না বলেই আমি তাপসকে কিছু জানাতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত মনে হলো, মিলি সব ঘটনাটা ভুলে গেছে নিশ্চয় যদি না ও খুবই সাংঘাতিক অভিনেত্রী হয়। শুনেছি স্লিপ ওয়াকাররা আগের রাত্রের কোনো ঘটনাই মনে রাখতে পারে না। এটাও হয়তো সেই ব্যাপার।

কিন্তু একটা রহস্যের সমাধান হলো না কখনো। মিলি কেন আমাকে দেখে চমকে যায় নি। কেন আমাকে দেখে বলেছিল, আপনি এত দেরি করলেন কেন? আমার তো কোনো কথা ছিল না মিলির সঙ্গে মধ্যরাত্রে নিরালায় দেখা করার? এমনকি চোখের কোণে ইশারাও হয় নি।

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে সোজা তিনতলায় গেলাম কেন? মিলি যে ওখানে থাকবে আমি তো তার বিন্দু বিসর্গও জানতাম না।

তাহলে আমিও কি ঘুমের মধ্যে হেঁটে গেছি? কিন্তু আমার যে সব মনে আছে।

কোনোদিন এই ঘটনাটা মিলির কাছে আর উল্লেখ করতে পারি নি। কি জানি, যদি মিলিও আমাকে অবিশ্বাস করে।

বৃত্তের বাইরে

রাত্তিরে শুতে যাবার আগে প্রত্যেকদিনই স্নান করা অভ্যেস রীণার। শীত গ্রীষ্ম মানে না। রীণাই দোতলার বাথরুমে নীল বাল্‌ব লাগিয়েছে। সারা বাড়িটা যখন নির্জন হয়ে আসে, তখন শাওয়ার খুলে দিয়ে নীল আলো জ্বেলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে।

একটা অস্পষ্ট চিৎকার রীণাও শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু গ্রাহ্য করে নি, সারা গায়ে সাবান মেখে সে তখন স্পঞ্জ দিয়ে পিঠ ঘষার চেষ্টা করছিল, ঠোঁটে আলতো গুণগুণ গান। আর একবার চিৎকার উঠতেই কোণের ঘরের দরজা খুলে মা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে চেঁচাচ্ছে কে? বৌমা? আমাদের বাড়িতে নাকি।

বন্ধ বাথরুমের ভেতর থেকে রীণা জবাব দিল, মনে তো হলো কাঞ্চার গলা। আবার বোধহয় আজ ওর মাথায় ভূত চেপেছে!

বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে মা জিজ্ঞেস করলেন, এই কাঞ্চা, কাঞ্চা? কি হয়েছে কি? চেঁচাচ্ছিস কেন?

একতলার কোণের ঘর থেকে কাঞ্চা হাউমাউ করে কি যেন বলে উঠলো। একটি বর্ণও বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হলো খুব ভয় পেয়েছে। বাথরুমের জানালা দিয়ে রীণা ধমকের সুরে বললো, এই কাঞ্চা চুপ কর। এত রাত্তিরে মানুষ জন ঘুমোবে না?

চিৎকার থামলো না, বরং সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে উঠলো,

মা ডাকলেন, দীপু, দীপু ঘুমিয়েছিস নাকি? আয় না একবার নিচে —বৌমা, তাড়াতাড়ি বেরোও।

রাত্তিরের স্নানটা তাড়াতাড়ি সারতে হলেই রীণা বিরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বেরুতেই হবে, সব জায়গায় স্পঞ্জ বুলোনো হলো না, তাড়াতাড়ি জল ঢেলে সাবান ধুতে লাগলো। মা ততক্ষণে শিপ্রাকেও ডেকে তুলেছেন। দীপুর গম্ভীর গলা শোনা গেল। কি হয়েছে কি? আজ আবার জ্বালাচ্ছে তো কাঞ্চাটা! বলছি ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও।

গত বছর কার্সিয়াং বেড়াতে গিয়ে এই নেপালী ছেলেটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওর বাবাই বলেছিল, এখানে খেতে পাচ্ছে না, কলকাতায় বাবুদের কাজ করে খেয়ে পরে তবু বাঁচবে। চৌদ্দ-পনেরো বছরের হাসি-খুশী ছেলেটা, যেমন বিশ্বাসী, তেমন খাটতে পারে, কোনো কথায় না নেই, বাড়িতে সবারই ছেলেটাকে খুব পছন্দ। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে ছেলেটাকে নিয়ে—সন্ধ্যের পরই ও কেমন যেন বদলে যায়, মুখ-চোখে ভয়ের ছাপ পড়ে, অন্ধকারের মধ্যে একা পড়ে গেলেই চেঁচিয়ে ওঠে। দারুণ ভূতের ভয় ছেলেটার। প্রথম প্রথম বাড়ির সবাই হাসি ঠাট্টা করে ওর ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বহু জন্মের পাহাড়ী কুসংস্কার সহজে যাবার নয়।

নিচ তলায় ভাড়ারঘরে শুতে দেওয়া হয়েছে কাঞ্চাকে, কিন্তু প্রায় রাত্তিরেই ও ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে। আসলে একা ঘরে শোয়ার অভ্যেস ওর নেই। কিন্তু বাড়ির চাকরকে আর কোথায় শুতে দেওয়া হবে—কিছুদিন দোতালার বারান্দায় শুতে দেওয়া হয়েছিল, তাতেও ওর ভয় কমে নি, তা ছাড়া নিচতলাটা একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকে। এখন ওর সঙ্গী হিসেবে একটা কুকুর কিনে দেওয়া হয়েছে, কুকুরটা রাত্রে ওর ঘরে শোয়। এমনিতে ছেলেটা দিনের বেলা সাহসী, দুপুরবেলা বৈঠকখানায় চোর ধরা পড়লো তখন কাঞ্চাই তো ছুটে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরেছিল, আর একটু হলে ভোজালি চালিয়ে দিত অথচ রাত্তির হলেই ওর যত রাজ্যের ভয়—রোজ

খাবার সময় ও রীণা আর শিপ্রাকে শোনায়—ভূতেরা নাকি ওর ঘরে ফিসফিস করে, ওকে ভয় দেখাবার জন্য হাসে। আসলে পুরোনো বাড়ি. মোটা মোটা দেয়ালে নোনা ধরার গন্ধ, দিনের বেলাতেও নিচতলাটা অন্ধকার হয়ে থাকে, সিঁড়ির তলার অন্ধকার জায়গাটার দিকে তাকালে এমনিতেই গা ছম্‌ছম্‌ করে। তবে কাঞ্চার আজকের চিৎকারটা যেন একটু বেশী চরম।

ওরা তিনজন নিচে নেমে গেছে। গোলমাল থামে নি, সবাই মিলে উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলছে। রীণা তাড়াতাড়ি ব্লাউজ সায়া পরে নিল, শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে খটাস্‌ করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। মাথাটা ভালো করে মোছা হয় নি, টপ্‌টপ করে জলে ঝরছে। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচে।

কাঞ্চার ঘরে উঁকি দিয়ে রীণা জিজ্ঞেস করলো, কি, কি হয়েছে কি? কাঞ্চার থেকেও এখন বেশী চেঁচাচ্ছে শিপ্রা, কিন্তু তার কথা শোনার আগে রীণা নিজেই দেখতে পেল। কাঞ্চার হাতে একটা শাবল, ঘরের মেঝেটা অনেকখানি খুঁড়ে ফেলেছে। এ ঘরের মেঝেটা অনেকদিন ধরেই এবড়ো খেবড়ো, বহুকালের ড্যাম্পে মাটি এরকম ফুলে ফুলে ওঠে। কাঞ্চা প্রায় বলে, রাত্তিরে নাকি ওর বিছানার তলায় গুম্‌গুম্‌ শব্দ হয়। তাই শুনে শিপ্রা বলেছিল, তোর ঘরের ঠিক নিচেই পাতাল পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ আছে। তাই না রে? আজ কাঞ্চা কারুকে কিছু না বলে শাবল দিয়ে সিমেন্টের মেঝেটা খুঁড়ে ফেলেছে। রীণা দেখতে পেল সেখানে একটা মাথার খুলি।

কাঞ্চা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানা তার রক্তহীন ফ্যাকাসে, গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরুল না এখন। শিপ্রা তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে, বাচ্চা কুকুরটা শুঁকছে সেই মড়ার মাথার খুলি —কুঁই কুঁই শব্দ করছে। রীণার বুকের মধ্যে ধক্‌ করে উঠলো, পায়ের জোর চলে গেল, মনে হলো, এক্ষুণি মাটিতে ঝুপ করে পড়ে যাবে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তীব্র গলায় বললো, একি! সঙ্গে সঙ্গে মা আর শিপ্রার কান্না মেশানো চিৎকার।

একমাত্র দীপুরই ঠাণ্ডা মাথা। সে জিজ্ঞেস করলো, এই ছোঁড়া তুই হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে ঘর খুঁড়তে গেলি কেন ?

মা বললেন কি সর্বনাশ! এটা কি করে এখানে এলো! এই দীপু—

—আমি তা কি করে জানবো! পুরোনো বাড়ি, কবেকার কি সব ব্যাপার!

—তোর দাদাকে খবর দে! আমার মাথা ঘুরছে—এই শিপ্রা, ওরকম করছিস কেন!

—দাদাকে খবর দেবার কি হয়েছে ?

মা আর শিপ্রার ভয় দেখে রীণার প্রথম আতঙ্কটা কেটে গেছে। মা শিপ্রা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে রয়েছেন, দু'জনেরই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। রীণা তাড়াতাড়ি উঠোনের আলোটাও জ্বেলে দিল। মাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললো, দেখেই তো মনে হচ্ছে বহুদিনের পুরোনো—

দীপু এগিয়ে পা দিয়ে খুলিটাকে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। মা আর্তস্বরে বললেন, ছুঁস্ না ছুঁস্ না—এই দীপু সরে আয়—মা দীপুর হাত ধরতে যেতেই দীপু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, দাঁড়াও না—আমার ডাক্তার বন্ধু আলোকের ঘরে দু'দুটো কঙ্কাল আছে, কতবার তাতে হাত দিয়েছি।

খুলিটা সত্যিই খুব পুরোনো, ভেতরে মাটি ভর্তি। চোয়ালের খানিকটা ফেটে গেছে, চোখের জায়গায় দুটো শূন্য গর্ত। শিপ্রা ভয়ে মার পিঠে মুখ গুঁজে দিয়েছে। দীপু বললো, মনে হচ্ছে এর নিচে আরও হাড়গোড় আছে, একটা গোটা মানুষই ছিল,—শ'খানেক বছর আগে কেউ বোধহয় একটা লোককে খুন করে এখানে পুঁতে ফেলেছিল—কিংবা এমনও হতে পারে, এ জায়গাটা ছিল কবরখানা।

রীণা বললো, কিন্তু বাড়ির ভিত খোঁড়ার সময় তা দেখে নি কেউ ?

—হয়তো বাড়ির মালিকই কাউকে পুতে রেখেছিল! যাক্ গে

এই কাঞ্চা বেরিয়ে আয়, কুকুরটা নিয়ে আয়।

ভয়, উত্তেজনা ও চেঁচামেচি চললো আরও কিছুক্ষণ। দীপু শেষ পর্যন্ত বললো, এখন এ ঘরে তালা দেওয়া থাক্, কাঞ্চা আমার ঘরেই শুয়ে থাকুক আজ। কাল সকালে আমি বাকি মেঝেটা খুঁড়ে দেখবো এখন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুই খুঁড়বি কেন ?

রীণা বললো, বলা যায় না হয়তো গুপ্তধন টুপ্তধনও থাকতে পারে।

দীপু হেসে বললো, যা বলেছো! হয়তো গুপ্তধন পুঁতে যখ দিয়েছিল। আয় কাঞ্চা, তোর বিছানা নিয়ে আয়। বৌদি, তুমিও না হয় মা'দের ঘরে গিয়ে শোও—ভয়-টয় পাবে রাত্তিরে।

—আমি অত ভয় পাই না!

—না, বৌমা তুমি আমার ঘরেই এসো।

কাঞ্চার ঘর বন্ধ করে উঠোনের আলো নেভাবার পর নিচতলাটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সিঁড়িতে ওঠার আগে শিপ্রা আবার মাকে জড়িয়ে ধরলো, রীণা রইলো সবার পেছনে। শিপ্রা কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, মনে হচ্ছে, উঠোনে এখনও একটা কিসের শব্দ হচ্ছে, না ?

রীণা বললো, ধ্যাৎ! কোথায় শব্দ।

দীপু বললো, শিপ্রাটার সব সময়ই ভয়—এত বড় মেয়ে, চল্, তোকে এখন একবার একা রেখে আসি নিচে।

—ওরে বাবা! শিপ্রা দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে ওপরে উঠে এলো।

রীণা মা'দের ঘরে গেল না। নিজের ঘরেই এলো শুতে। ভালো করে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, খাটের নিচেও একবার উঁকি মেরে দেখলো!

একা শোওয়া অভ্যেস আছে রীণার। এক সপ্তাহ অন্তর এক সপ্তাহ করে নাইট ডিউটি থাকে দেবনাথের খবরের কাগজের

চাকরি, রাত তুটো-আড়াইটের সময় ডিউটি শেষ হয়। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস রাত আড়াইটের পরই হেঁটে বাড়ি ফিরে আসতো, জেগে থাকতো রীণা। এখন রীণাই তাকে বারণ করে দিয়েছে অত রাত্রে ঝুঁকি নিয়ে ফিরতে। গুণ্ডা-বদমাইসদের হাতে পড়তেই পারে, একদিন পুলিশের গাড়িও থানায় নিয়ে গিয়েছিল, নেহাত খবরের কাগজে চাকরি করে বলেই অফিসে টেলিফোন করে ছাড়া পায়।

কলেজে পড়ার সময়ও রীণা বরাবর হোস্টেলে কাটিয়েছে। তার ঘরে অবশ্য আরও তুটি মেয়ে শুতো, কিন্তু কখনো কখনো তারা হয়তো বাড়িতে গেছে আর ফেরে নি--রীণা একা ঘরে শুয়ে থেকেছে, তার কোনোদিন ভয় করেনি।

খাটের তলা-টলা দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রীণা শাড়ী-ব্লাউজ, সায়া খুলে নাইটি পরে নিল। সারা বাড়ি এখন আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, এ পাড়াটাও বেশ নির্জন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রীণা ভাবলো, শিপ্রার বড় বেশী বেশী ভয়। কচি খুকি তেইশ বছরের মেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছে! কাঞ্চার চেয়েও ওর ভয় যেন বেশী!

রীণার ভূতের টুতের ভয় নেই! কিন্তু চোর ডাকাতকে তার বড্ড ভয়। রাত তুপুরে তার ঘরে যদি একটা চোর ঢোকে—ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখতে পেলেই রীণা হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে! অবশ্য তার আগে ভালো করে দেখে নেবে সত্যিকারের চোর কিনা! দেবনাথের মতো করবে না! দেবনাথ একদিন মাঝরাতে বাথরুমে যাবার জন্যে বেরিয়েছিল—সিঁড়িতে দীপুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, চোর! চোর! দীপুও তখন বাথরুমে যাবার জন্যই নিচে এসেছিল, সে যত বলে দাদা আমি। দেবনাথ শুনতেই পায়নি—তারস্বরে চেঁচিয়েছিল, চোর, চোর!

চুল আঁচড়ানো শেষ করে রীণা মুখে ক্রিম মাখতে লাগলো। তারপর গ্লিসারিণের শিশি থেকে খানিকটা গ্লিসারিণ মাখলো ঠোঁটে আর কনুইয়ের কাছে। অনেক মেয়ের তুই কনুয়ের কাছে কি রকম

থরথরে হয়ে থাকে। রীণা একদম পছন্দ করে না। রীণা আবার ভাবলো দীপুর কিন্তু সাহস আছে। দীপুর স্বাস্থ্য ভালো হলেও সবাই সাহসী হয় না। তবে এটা ঠিক, দীপু যখন পা দিয়ে মড়ার মাথার খুলিটায় ঠোক্কর মারছিল, তখন রীণারও বুকের মধ্যে শিরশির করছিল একটু একটু। ঠিক ভয় নয়, অন্য রকম কি যেন। সুইচ টিপলেই ইলেকট্রিক আলো, এর মধ্যে ভয় পাবার কি আছে। কিন্তু শুধু একটা মড়ার মাথা দেখলেই কি রকম কি রকম যেন লাগে। ওটা ওখানে এলোই বা কি করে। ঘরের মেঝেতে মড়ার মাথা। কেউ কখনো এরকম শোনে নি।

দেবনাথের বাবাই এই বাড়িটা কেনার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন, হঠাৎ তিনি এলাহবাদে অফিসের কাজে গিয়ে সেখানেই হার্ট ফেল করেন। দেবনাথরা পরে বাড়িটা কিনে ফেলে, সাঁইতিরিশ হাজার টাকায় বাড়িটা একটু সস্তাই বলতে হবে—যদিও বাড়িটা খুব পুরোনো, কিন্তু জায়গা আছে অনেকটা। কিন্তু এ পর্যন্ত বাড়িটা সম্পর্কে কোনো দুর্নাম তো কখনো শোনা যায় নি। এই এগারো বছরে ওরাও দেখেনি কিছু। রীণারই তো বিয়ে হয়েছে আট বছর।

আলো নিবিয়ে খাটে উঠতে গিয়ে রীণার হঠাৎ একটু ভয় করলো। যতক্ষণ আলো জ্বালা ছিল, তার কিছুই মনে হয়নি। খালি তার মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যেন কেউ আছে। প্রথমে ভয়টা কাটিয়ে ফেলার জন্য রীণা চোখ বুজে শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ, অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করলো, পুজোর সময় পুরী যাবার কথা বলেছিল দেবনাথকে, কিন্তু দেবনাথ কিছুতেই নাকি ছুটি পাবে না—প্রায় তিনবছর কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া হয়নি…। রীণা কিছুতেই ভয়টা তাড়াতে পারছে না। খালি মনে হচ্ছে মাথার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে! তার নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে—তার মুখখানা রীণার মুখের খুব কাছে ঝোঁকানো।

একটুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে ভয়টা যখন ক্রমশঃ বাড়ছে,

তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তখন ঝট করে রীণা চোখ মেলে তাকালো, ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালালো। কেউ কোথাও নেই। নিছক মনের বিকার। অন্য কোনো রাতে এরকম মনে হয় না। শুধু আজই—নিচতলার ওটা দেখার পর···মনটা দুর্বল হয়ে গেছে। খাটের তলা, আলমারি—আলনার পাশগুলো আবার ভালো করে দেখলো, কোনোরকম সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণই নেই। দরজা জানলা সব বন্ধ, ঘরের ভেতরটা একটু গুমোট হয়ে গেছে। সেই জন্যই বোধ হয়······।

রীণা দারুণ জেদী মেয়ে। অকারণে সে আজ ভয় পাচ্ছে বলে, নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠলো। একটা জানালা খুলে দিল রাস্তার দিকের—সেখান থেকে তাকিয়ে রইলো বাইরে। ঠুন্ঠুন্ করে একটা রিক্শা যাচ্ছে, রিক্শার ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে আছে একটা লোক—তাছাড়া রাস্তায় আর জন-মনুষ্য নেই। এক ঝলক হাওয়া এসে তার মুখে লাগতেই ভয়টা অনেকটা কেটে গেল।

অন্য মেয়ে হলে, ওইটুকুতেই খুশী হয়ে আবার এসে শুয়ে পড়তো। কিন্তু রীণা অকারণে ওরকম ভয় পাবার জন্য নিজের মনটাকে একটু শিক্ষা দিতে চাইলো। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। সাধারণত সে পাতলা স্বচ্ছ নাইটি পরে ঘরের বাইরে বেরোয় না রাত্তিরে—কিন্তু ড্রেসিং গাউনটা আজই কেচে দিয়েছে এখনও শুকোয় নি। এখন সবার দরজা বন্ধ, কেউ তাকে দেখবে না অবশ্য।

ভয়টাকে একেবারে শায়েস্তা করার জন্যই রীণা বারান্দার আলো জ্বালালো না। অন্ধকারে রেলিং-এর কাছে এসে তাকালো উঠানের দিকে। ওপরে তিনতলায় দীপুর ঘরে আলো নিভে গেছে। মা শিপ্রার ঘরও অন্ধকার। রীণার ছিটকানি খোলার শব্দ কেউ শোনে নি। অন্ধকারে চোখটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করে রীণা উঠোনের দিকে চেয়ে রইল। তার ঘরের দরজা একখানি খোলা, একটা আলোর রেখা এসে পড়েছে বারান্দায়। নিচতলাটা সেইজন্য আরও বেশী

অন্ধকার লাগছে। একটু বাদে চোখ খানিকটা সয়ে এলো। কাঞ্চার ঘরটা তালা বন্ধ দেখা যাচ্ছে—ওর ভেতরে আছে মাথার খুলিটা—কোথাও কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রীণা পেছনে ফিরতে যাচ্ছে—এমন সময় একটা শব্দ শুনতে পেল নিচে। কে যেন উঠোনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়ে গেল হাল্কা পায়ে।

চোরেরা ভেতরে একটা বাচ্চা ছেলেকে আগে ঢুকিয়ে দেয়। হঠাৎ যেন তার সব ভয় চলে গেছে, অদম্য সাহস এসেছে বুকে। দৃষ্টি প্রাণপণে তীক্ষ্ণ করে আবার তাকালো উঠোনে, খুঁজতে লাগলো। আবার সেই শব্দ।

রীণা চেঁচিয়ে ডাকলো, দীপু! দীপু! আলো জ্বালার জন্য ছুটে গেল সুইচের দিকে। যে-দৌড়াচ্ছে, সে মানুষ নয়। মানুষ হতে পারে না। রীণা এবার স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে একটা কালো কুচকুচে বালিশের মতন কিছু একটা উঠোনের এ পাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে গেছে। লম্বা লম্বা চুলওয়ালা একটা মানুষের মাথাও হতে পারে—সেই সঙ্গে চাপা কান্নার মতন আওয়াজ।

রীণার ডাক নিশ্চয়ই দীপু শুনতে পায় নি, মা-শিপ্রাও জাগে নি। কিন্তু আলো জ্বলতেই রীণা এবার দেখতে পেল তাদের কুকুরটা নিচতলার উঠোনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর ডাকছে কুঁই কুঁই করে। কুকুরটাকেও দীপু তিনতলায় নিয়ে গিয়েছিল, কোন ফাঁকে আবার নিচে নেমে গেছে। কুকুরটা অকারণেই উঠোনের এপাশ-ওপাশ ছুটছে। এবার সত্যিই দারুণ ভয় পেয়েছিল রীণা। ইস্, মানুষ এই ভাবেই তো ভয় পায়। মনটা আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই কুকুরটাকে চিনতে পারেনি! কালো রঙের বালিশ কিংবা শুধু কোনো মানুষের মাথা আবার উঠোন দিয়ে গড়াতে পারে নাকি! ভাগ্যিস দীপুরা উঠে নি, নইলে দীপু নিশ্চয়ই তাকে ঠাট্টা করে করে একেবারে কাঁদিয়ে ছাড়তো। কুকুরটা ওখানে গিয়ে ওরকমভাবে ছোটাছুটি করছে কেন। জন্তু জানোয়ারদের ব্যবহারের কি কোনো

ঠিক আছে। রীণা ফিসফিস করে ডাকলো, 'লিজি, লিজি, ওপরে উঠে আয়।

কুকুরটা তবুও শুনলো না, অনবরত উঠোনে ছোটাছুটি করছে, যেন কিছু একটা জিনিসকে সে তাড়া করে যাচ্ছে বারবার, অথচ কিছুই নেই। রীণা আবার ডাকলো, লিজি! লিজি? কাম হিয়ার!

তিনতলায় দীপুর ঘরে খুট করে আলো জ্বলে উঠলো। একটু আগে রীণার চিৎকার সে শুনতে পায়নি, এখন এই ফিসফিসানি ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেছে।

নেমে আসছে।

রীণার তখন খেয়াল হলো, সে সামান্য একটা পাতলা নাইটি পরে আছে! শরীরের সব কিছুই এতে স্পষ্ট দেখা যায়, এই পরে দেওরের সামনে দাঁড়ানো যায় না। রীণা ঝট্ করে নিজের ঘরে ঢুকে, আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে। সে যে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সেটাই দীপুকে জানবার দরকার নেই। কিন্তু বারান্দার আলোটা নেবানো হয়নি।

দীপু দোতলায় নেমে এসে একবার অনুচ্চ গলায় জিজ্ঞেস করলো কে? কে কথা বলছিল?

রীণা কোনো সাড়া দিল না। মা আর শিপ্রা দু'জনেরই ঘুম বেশ গাঢ়, আজ আবার ভয় পাবার পর বোধহয় বেশী করে ঘুমোচ্ছে, দীপুর গলার আওয়াজে কেউ জাগল না দীপু বারান্দার এদিকে এলো, রীণার ঘরের দরজার কাছে একবার দাঁড়ালো, ভেতর থেকে রীণা সব বুঝতে পারছে। দীপু চাপা গলায় বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলো, বৌদি, ঘুমোচ্ছ। রীণা একবারও উত্তর দিল না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দীপু উত্তর না পেয়ে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বারান্দার আলো নিবিয়ে ডাকতে লাগলো লিজি, লিজি, আঃ, আঃ, লিজি। রীণা শুনতে পেল দীপুর গলার আওয়াজ ক্রমশ একতলার দিকে নেমে যাচ্ছে।

রীণা সামান্য একটু হেসে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। দু'হাতের পাঞ্জায় চোখ দুটো ঢেকে রইলো। এখন আর তার ভয় ভয় করছে না।

দেবনাথ বললো, পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। খুন-টুনের ব্যাপার মনে হচ্ছে।

দীপু বললো, কিন্তু দাদা, এ অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই। পুলিশ এখন এর কি করবে?

—কি করে বুঝলি অত পুরোনো?

—দেখছো না খুলিটা ছাড়া আর সবই ঝুরঝুরে হয়ে গেছে।

শিপ্রা দিনের আলোতেও ভয় পাচ্ছে, শুকনো গলায় বললো, ছোড়দা আরো একটু খুঁড়ে দেখো না, যদি আরও থাকে টাকে?

—তা বলে সারা বাড়ির ভেতরই খুড়ে ফেলবো নাকি?

দেবনাথ জিজ্ঞেস করলো, কি করে জানলি আর নেই?

এটা কারখানা ছিল না, বোঝাই যাচ্ছে। ডেড বডিটাকে লম্বা-লম্বি শুইয়ে কবর দেওয়া হয়নি। একটা পুটলি মতন করে এখানে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। বস্তা আর পুরোনো খবরের কাগজের টুকরোও রয়েছে।

অনেক সময় ছোট ছেলের মড়া ওই রকমভাবে কবর দেয়।

ছোটো ছেলে নয়, রীতিমতন বয়স্ক—স্কাল দেখলেই বোঝা যায়।

খুব সম্ভবত কোনো মহিলার স্কেলিটন।

—মেয়েছেলে?

—হ্যাঁ, জামা-কাপড়ের কোনো চিহ্ন নেই যদিও, কিন্তু ছাখো না, ভেতরে দু'তিনটে ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি রয়েছে।

—যাঃ, তোকে আর ডিটেকটিভগিরি করতে হবে না। পুলিশে খবর দিয়ে আয়। পুলিশ কিছু করুক না করুক, খবর দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

মা, বললেন, তখুনি আমি বলেছিলুম এই পুরোনো বাড়ি কিনতে হবে না! অপয়া বাড়ি! এর চেয়ে মধ্যমগ্রাম কিংবা বারাসতে একটু ছোট দেখে নতুন বাড়ী হলে······

দীপুই সকলেবেলা শাবল দিয়ে মেঝে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলে হাড়গোড় সব বার করেছে। দীপুর উৎসাহ বেশী ছিল গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার। কতকগুলো হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। বেশ গভীর গর্ত করে মড়াটাকে পোঁতা হয়েছিল বোঝা যায়। যে কোনো কারণেই হোক—সেটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। ঘরের মেঝের খানিকটা জায়গা ঢিপি মতন হয়ে ফুলেছিল। পুরোনা বাড়ির মেঝে ড্যাম্প লেগে অনেক সময়ই এরকম হয়--আগে ওদের কিছু মনে হয়নি এ সম্পর্কে।

ব্যাপারটা যে অনেকদিনের পুরোনো তার আর একটা প্রমাণও পাওয়া গেল। গর্তটার মধ্যে ছেঁড়া চটের বস্তা আর খবরের কাগজের টুকরো ছিল কয়েকটা!

ড্যাম্পে কাগজগুলো লালচে হয়ে পচে গেছে, তবুও দীপু তার পাঠোদ্ধার করার অশেষ চেষ্টা করে একটুখানি পডতে পারলো। কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরে প্রস্তাবের একটা প্রতিবাদ সভার রিপোর্ট। কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানি ১৯১১ সাল পর্যন্ত? এ কাগজটা নিশ্চয়ই তারও আগের।

বাড়িতে এ রকম একটা সাংঘাতিক কাণ্ড, রীণা কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত নয়। সে মাঝে মাঝে ওখানে এসে ঘুরে যাচ্ছে, আর অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। কি করে খবর ছড়িয়ে যায় কে জানে, তাদের বাড়ির সামনে বিরাট ভিড় জমে গেছে, পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে নানা উদ্ভট গল্প জুড়ে দিয়েছে। রান্নার ঠাকুরটা রাত্রে এখানে শোয় না—সে থাকে কাছেই একটা বস্তিতে। সকাল-বেলা সে এসে এই কাণ্ড দেখে হৈচৈ করেছিল, রীণা তাকে ধমক দিয়ে নিয়ে এসেছে রান্নাঘরে—একটা মড়ার মাথা খুঁড়ে বার করা হয়েছে বলে কি বাড়িতে সবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হবে? কেউ অফিস-টফিস যাবে না? একটা ব্রিটিশ কোম্পানিতে স্টেনো-গ্রাফারের কাজ করে রীণা, সে অফিসে হুট-হাট করে ছুটি নেওয়া যায় না।

সবাই মিলে জেরা শুরু করেছে কাঞ্চাকে। দিনের বেলা কাঞ্চার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। চোর-ডাকাত ধরার মতই ভূতের রহস্য বার করে ফেলার কৃতিত্বে ও এখন গর্বিত। সে জোর দিয়ে বলছে, জিন মাটির তলায় আর থাকতে চাইছিল না, তাই রোজ রাত্তিরে সে শুয়ে পড়ার পর তার কানে কানে কথা বলতো। জিন চেয়েছিল গর্ত খুঁড়ে তাকে বার করে দিতে।

এই রহস্যটা নিয়ে সবাই খুব মশগুল হয়ে রইলো। এখন মড়ার মাথাটা দেখার পর—অনেকেই হয়তো ভয় পেতে পারে, কিন্তু কাঞ্চা আগে থেকেই টের পেয়েছিল কি করে? সে তো অনেকদিন থেকেই বলছিল, ও ঘরে ভূত আছে, ও ঘরের মাটির তলায় খুটখুট করে শব্দ হয়! সেটা কি করে সম্ভব? এর ব্যাখ্যা কি?

নাইট ডিউটি থেকে ফিরে সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোয় দেবনাথ। তখনও ঘুমোতে পারে নি, এই জন্য মুখখানা তার বিরক্ত তার ওপর এই ঝঞ্ঝাট! সে একটু শান্তিপ্রিয় লোক, বেশী লোকজন তার পছন্দ হয় না। দেবনাথ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই দীপু, ওকি করছিস। না, না—বারণ করছি—

দীপু ততক্ষণে হাতে শাবল নিয়ে গর্তটার মধ্যে নেমে পড়েছে। গেঞ্জী পরা তার সবল শরীরে ফুলে উঠেছে হাতের মাস্‌ল। হাসতে হাসতে বললো, দাঁড়াও দেখি না—নিচে আরও কিছু আছে কিনা!

না, দেখতে হবে না। উঠে আয়! একটা ডেডবডি বছরের পর বছর পচেছে ওখানে, অস্বাস্থ্যকর জায়গা।

দীপু তার দাদার সব কথা শোনে না। উঠে না এসে শাবল দিয়ে এদিক ওদিক খুঁচিয়ে দেখতে লাগলো। ঘরের দরজার কাছে ভিড় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, একটি অতি উৎসাহী ছেলে তো হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল। নতুন করে চেঁচামেচি শুনে রীণা আবার এসে জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু পাওয়া গেল? রান্নার ঠাকুরকেও সেদিকে ছুটে আসতে দেখে তাকে ধমক দিয়ে বললো, আবার তুমি আসছো কেন? যাও ডালটা নাবিয়ে ফেলো! ন'টা বাজে প্রায়।

মা এসে পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলেন, দীপু শিগগির উঠে আয়, শিগগির আয় নইলে আমি···

দু'হাতের তালুতে ভর দিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে এলো দীপু। হাসতে হাসতে বললো, নাঃ আর কিছু নেই ডেফিনিট। গুপ্তধন-টুপ্তধন নয়, ক্লিন মার্ডার কেস।

দেবনাথ বললো, তুই যদি পুলিশের কাছে না যাস্, আমিই যাই তা হলে। অন্ততঃ ভিড় সামলাবার জন্যও পুলিশ ডাকা দরকার।

দীপু কোনো উত্তর না দিয়ে দাদার প্রস্তাবেই সম্মতি জানালো। অর্থাৎ মাটি মাখা গায়ে তার পক্ষে থানায় যাওয়ার চেয়ে, যেতে হলে দাদারই যাওয়া উচিত। বিরক্ত মুখে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল দেবনাথ।

মা বললেন, দীপু কারুকে ছুঁবি না, যা আগে চান করে আয়!

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, দাঁড়াও না!

—না, যাচ্ছি না, কোন্ অজাত-কুজাতের মড়া তার ঠিক নেই।

—মড়ার আবার জাত কি মা! আগেই তো জাত-ফাতের ঝামেলা।

ভিড়ের মধ্যে পাড়ার কয়েকজন প্রবীণ লোকও ছিল। দীপু তাদের জিজ্ঞেস করলো জ্যাঠামশাই, আমাদের আগে যারা এ বাড়িতে ছিল—তাদের ফ্যামিলিতে কোনো খুন-টুন কিংবা নিরুদ্দেশের ঘটনা শুনেছেন।

দু'তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে কথা শুরু করলেন। তাদের কথা থেকে এইটুকু জানা গেল যে, আগে থাকতো শুধু বুড়ো বুড়ি আর তাদের একটি ছোট ছেলে। বুড়ো বুড়ির বড় ছেলে চাকরি করতো এলাহাবাদে, তার সঙ্গে মা'র বেশী বনিবনা ছিল না। বুড়ো মারা যাবার পর, বড় ছেলে এসে মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে গেছে এলাহাবাদে আর উকিলের মারফত বিক্রি করিয়েছে এ বাড়ি। বুড়ো মরার পর পাড়ার ছেলেরাই তাকে পুড়িয়ে এসেছে, সুতরাং সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে এ বাড়ি অবশ্য বুড়ো-বুড়ির পৈতৃক ছিল না। তাঁরাও এ বাড়ি কিনেছিলেন বছর তিরিশেক আগে। কিন্তু বছর তিরিশেক আগে এ বাড়ি কার ছিল সে সম্পর্কে পাড়ার প্রবীণদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেল। কেউ বললেন, আগে এ বাড়ির মালিক ছিলেন এক মুসলমান জমিদার, তিনি এ বাড়ি ভাড়া খাটাতেন, আবার কেউ বললেন, এখানে আগে ছিল একটা ইস্কুল। অর্থাৎ তিরিশ বছর আগেকার স্মৃতি কারুরই নিশ্চিত নয়।

ভিড় ঠেলে বাড়ির একেবারে ভেতরে চলে এলো এক যুবক! ধুতি আর হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। হন্তদন্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, দীপুদা, কি ব্যাপার? বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে······শুনলাম নাকি খুন হয়েছে এ বাড়িতে?

দীপু তাকে বিশেষ পাত্তা দিল না, এক পলক তার দিকে তাকিয়ে আবার বৃদ্ধদের গালগল্প শুনতে লাগলো। ছেলেটি দীপুর হাত ছুঁয়ে আবার বললো, কি হয়েছে দীপুদা? কী ব্যাপার?

দীপু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শুধু বললো, মড়ার মাথা! এমনভাবে সে উচ্চারণ করলো, যেন বলতে চায়, আমার মাথা।

ছেলেটি দমলো না, বললে, ভিড় দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটা কাজে যাচ্ছিলুম, তারপর বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে।

ছেলেটির ভাব এমন যেন, এ বাড়ির কোনো বিপদ হলে তার প্রতিকার করা ওরই দায়িত্ব। সমস্ত কাজ তুচ্ছ করে তাকে ছুটে আসতেই হবে। দীপু তাকে বললো, ঐ শাবলটা সরিয়ে রাখো তো রমেন, গর্তে পড়ে যাবে!

রমেন নিচু হয়ে শাবলটা তুলতে তুলতে আড়চোখে একবার শিপ্রার দিকে তাকালো। কঙ্কালের খুলিটার দিকেও তার চোখ পড়েছিল, কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্যই করলো না, বারবার তাকাতে লাগলো শিপ্রার দিকে। শিপ্রা ভিড় থেকে একটু সরে চলে এলো

সিঁড়ির কাছে, রমেনও এক ফাঁকে এসে গেল তার পাশে।

পুলিশ যখন এলো, রীণা তখন অফিসে বেরুচ্ছে। ভিড় ঠেলে রীণা বেরুতে পারছিল না, পুলিশের জন্যই ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটা তখন লোকে লোকারণ্য। কত রকম গল্প লোকের মুখে মুখে তখন ফিরছে তার ঠিক নেই এ বাড়ির প্রত্যেকটা লোকই এখন দর্শনীয়। সিনেমার অভিনেত্রীকে দেখার মতন লোকে ভিড় করে এসেছিল রীণাকে দেখার জন্য। অফিসে যাবার সময় রীণা সানগ্লাস পরে, হালকা লাল রঙের শাড়ী আর ব্লাউজে রীণাকে দেখাচ্ছে খুব সুন্দর।

দেবনাথকে দেখে রীণা বললো, আমি অফিস চললুম বুঝলে, তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, এসব ঝামেলা চুকিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো।

দেবনাথ বলল, আজ না গেলে পারতে না?

--উপায় নেই! কালকে কয়েকটা ইনকমপ্লিট চিঠি আমার ড্রয়ারে রেখে এসেছি। সেগুলো আমি না গেলে কেউ খুঁজে পাবে না, আর চিঠিগুলো যদি আজ না যায়, ডেভিস সাহেব রেগে আগুন হয়ে যাবেন।

দেবনাথ পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল, ইনি আমার স্ত্রী। এর অফিস আছে, গেলে আপত্তি নেই তো!

ইন্সপেক্টরটি অতিরিক্ত ভদ্র হয়ে বললেন, না, না আপত্তি কিসের। অফিস যাবেন না কেন! যা কেস শুনছি—

রীণা হাত ব্যাগ খুলে বললো, এই নাও আলমারির চাবি, তোমার পা-জামা-টামা বার করে রাখতে একদম ভুলে গেছি। চলি তাহলে!

উঠোনে চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে ইন্সপেক্টরকে। মুখ চোখ দেখলে মন হয় এ ব্যাপারে যেন বিশেষ কোনো উৎসাহই নেই। নেহাত বেড়াতে এসেছেন।

দেবনাথ হঠাৎ অকারণে শিপ্রাকে একটা ধমক দিয়ে বললেন,

এই খুকি, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? চা কর না ! সকাল থেকে চা খাই নি ভালো করে।

শিপ্রার পাশ থেকে রমেন ছিটকে সরে গেল। শিপ্রা অপ্রসন্ন মুখে চলে গেল রান্না ঘরের দিকে।

দীপু ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলো, প্রথমে কার এজাহার নেবেন ?

ইন্সপেক্টর হেসে বললেন, আপনি বুঝি খুব ডিটেকটিভ বই পড়েন ?

—হ্যা, না মানে কেন বলুন তো ?

আপনার ভাব দেখলেই বোঝা যায়। শুনুন, সে রকম কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটার আশা নেই, ইংরেজী গোয়েন্দা গল্প হলে হয়তো দেখা যেত, এই পঞ্চাশ বছরের পুরোনো কেস থেকেই একটা বিরাট রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের এই বছরই এত কেস পেণ্ডিং আছে—যে পঞ্চাশ বছরের বাসি মড়া ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় আমাদের নেই।

—তা হলে এগুলো কি হবে ? এই হাড়টার ? রাস্তায় ফেলে দেবো ?

—একটু বাদে থানা থেকে ডোম পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে বস্তায় ভরে সব নিয়ে যাবে। 'একটা রুটিন মাফিক ফরেনসিক টেস্ট হবে —তবে বোঝাই যাচ্ছে, এ নিয়ে কোনো কেস ওপন্ করা হবে না। এমনিতেই সব মার্ডার কেস্ সল্ভ করা যায় না, আর এতো মশাই হাফ্ সেঞ্চুরি আগের ব্যাপার।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ইন্সপেক্টর দেবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো মশাই খবরের কাগজের লোক ! ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপার কি বুঝছেন ? মিটবে শিগগিরি।

দীপু জিজ্ঞেস করলো, ফরেনসিক টেস্টে জানা যাবে, কঙ্কালটা কোনো পুরুষের না মেয়ের ?

—তা জানা শক্ত নয়। কিন্তু জেনে কি হবে।

—আমার ধারণাটা ঠিক কিনা বুঝতে পারতুম। আমার ধারণা এটা একটা মেয়েরই, তুটো ভাঙা চুড়ির টুকরো—

—এমনও তো হতে পারে—কোনো মেয়েই এই লাশটা পুঁতে ছিল। গর্ত করার সময় তার হাতের চুড়ি ভেঙে—

—একটা মেয়ের পক্ষে সেটা টু-ম্যাচ্। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একটা মেয়ে আর কাউকে খুন করে আবার নিজেই গর্ত খুঁড়ে ডেড বডি পুঁতে রাখবে এতটা ভাবা—

ইন্সপেক্টর হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন, আপনার বুঝি ধারণা ষাট বছর আগে মেয়েরা খুব শান্ত-শিষ্ট ছিল? তখন তারা খুন-টুন করতো না।

দীপু বললো, তখন কেন, এখনও কোনো মেয়ের পক্ষে অতটা করা সম্ভব নয়।

ইন্সপেক্টর বললেন, মেয়েদের চেনেন না আপনি! আমাদের লাইনে থাকলে···দেখলুম তো অনেক, মেয়েরা যেমন দেবীর মতনও হতে পারে, তেমনি যদি আবার—ইন্স্‌পেক্টর হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে প্রসঙ্গ বদলে বললেন, নেপালী চাকরটাকে একবার থানায় পাঠিয়ে দেবেন। ওর একটা স্টেটমেণ্ট নিয়ে রাখতে হবে—নিছক ফর্মালিটি আর কি!

ভিড় কাটতে কাটতে তুপুর গড়িয়ে গেল। খিদেয় পেট জ্বলছে দেবনাথের কিন্তু খাবার উপায় নেই। শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য মা পুরুতমশাইকে ডাকতে পাঠিয়েছেন, তার আগে খাওয়া হবে না। দীপু আজ অফিস যায় নি। শিপ্রা কলেজে যায় নি। রীণা গেছে বলে মা তখন থেকে গজগজ করছেন। রীণাকে একটু ভয় পান তিনি—রীণা যখন যায় তখন শাশুড়ীকে বলেই গেছে, কিন্তু তখন তিনি আপত্তি করতে পারেন নি। এখন বলতে শুরু করেছেন, প্রেতাত্মার বিহিত মন্ত্র পড়ে না তাড়ালে কখন কি বিপদ হয় মানুষের! আজকের দিনে বাড়ি থেকে কারুরই বেরুনো উচিত নয়!

দীপু ঠাণ্ডা করে বললো, ভূত কি বৌদিকে অফিস পর্যন্ত তাড়া

করবে নাকি ?

মা বললেন, যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলিস না! ভূতের কথা বলছি নাকি ? আত্মা বলে একটা জিনিস আছে, সেটা অন্তত মানবি তো ? এতকাল মাটির তলায় চাপ পড়েছিল।

—আত্মা আবার কোথাও চাপা পড়ে থাকে নাকি ? সে তো শুনেছি হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় !

—তুই থামতো ! দেবু তুই বৌমার অফিসে একবার ফোন করে খবর নে না ?

দেবনাথ বললো, খবর আবার কি নেবো ?

ঠিক মতন অফিসে পৌঁচেছে কিনা—তা ছাড়া বলে দে, আজ যেন সন্ধের আগেই বাড়িতে ফেরে !

—এখন আর ফোন-টোন্ করতে যেতে পারবো না। ঘুমে আমার চোখ টেনে আসছে, পেটে খিদে জ্বলছে কোথ্ থেকে একটা মড়ার মাথা এসে বাধিয়েছে যত ঝামেলা !

রমেন নামের ছেলেটিই পুরুতমশাইকে খবর দেবার ভার নিয়েছিল। সে ফিরে এসে বললো, পুরুতমশাইকে পাওয়া গেল না, তিনি নবদ্বীপ গেছেন কি যেন কাজে। যেন দোষটা তারই, রমেনের মুখখানা সেই রকম কাঁচুমাচু। দেবনাথ বললো, ভালই হয়েছে। দাও ঠাকুর খেতে দাও। আর দেরি করতে পারছি না।

দীপু বললো, রমেন তুমিই তো বামুনের ছেলে, তুমিই ক'টা মন্ত্র-টন্ত্র আওড়ে দাও না।

—আমি তো মন্ত্র জানি না। অন্য পুরুতের খোঁজ করবো ?

মা জিজ্ঞেস করলেন, অন্য পুরুত কোথায় পাবে ? আর কারুর ঠিকানা জানো ?

—না, তা জানি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখবো ?

দীপু হাসতে হাসতে বললো, একি দুর্গাপুজো কিংবা সরস্বতী পুজো পেয়েছো নাকি, যে রাস্তা দিয়ে অনবরত পুরুত যাবে ?

দেবনাথ বিরক্ত ভাবে বললো, আঃ কি হচ্ছে কি ? মা, আজকেই

কি তোমার ওসব না করলে নয়? রবিবার দিন না হয় পুরুত ডেকে তোমার যা খুশী করিও? এখন খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো, আমাকে আবার সারারাত জেগে আজ ডিউটি দিতে হবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে রীণা ঘড়ি দেখলো। ঠিক পাঁচটা পাঁচ। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই টাইপরাইটারে ঢাকনা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রীণা কি যেন ভাবলো। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো ময়দানের দিকে—রাস্তা পেরিয়ে ও পাশের ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো।

পার্ক স্ট্রিট ক্রসিং-এ অন্তত শ'খানেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লাল আলোর সামনে। বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে আজ বিকেলে। রীণার একটু খিদে পেয়েছে, খুব ইচ্ছে করছে বাদাম ভাজা কিনতে কিন্তু একা একা রাস্তা দিয়ে বাদাম খেতে খেতে যেতে কি রকম যেন লাগে। রীণা একবার পেছনে তাকালো, তাকিয়ে সেই লোকটাকে আবার দেখতে পেল। অফিস থেকে বেরিয়েই গেটের উল্টোদিকে এই লোকটাকে দেখেছিল তখন কিন্তু খেয়াল করে নি, কিন্তু ট্রাম স্টপেও লোকটাকে ঠিক তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটার চেহারা দেখলে তো অভদ্র মনে হয় না! রীণার দিকেই চেয়ে আছে। এখন লোকটা আসছে তার পেছন পেছন। এসব রীণার গা-সহা হয়ে গেছে। অফিস থেকে বেরিয়েই রীণা ট্রামে ওঠে না। এসব পাড়ায় একা কোনো মেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই কেউ না কেউ তার পিছু নেবে! এই লোকটাকে দেখলে তো মনে হয় শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু চোরের মতন মুখ করে তার পেছন পেছন আসছে। সামনাসামনি এসে কথা বলার নিশ্চয়ই সাহস হবে না। বেশ খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে, অতি সূক্ষ্ম একটু আনন্দ এবং গর্ব বোধ করলো রীণা তার এখন একত্রিশ বছর বয়েস—তবুও তাকে দেখে পুরুষমানুষেরা আকৃষ্ট হয়।

আর একটা কথা মনে পড়তেও রীণার হাসি পেল। দেবনাথও বিয়ের আগে তাকে এইরকম অনুসরণ করতো। কলেজ থেকে ফেরার

পথে রীণা রোজ দেখতো করুণ ব্যর্থ প্রেমিকের মতন মুখ করে দেবনাথ তার পেছনে পেছনে আসছে। একদিন রীণা ওকে অনেক কড়া কথাও শুনিয়ে দিয়েছে!

বড় গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল সুবিমল, রাণীকে দেখে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, আজ একেবারে ঠিক সময়ে এসেছো।

রীণা বললো, আজ থাকতে পারবো না, আজ এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

—ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো সেই অনুসরণকারী লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্তত করছে। এদিকে আসতে ও সাহস করছে না, আবার ঠিক উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতেও পারছে না। লোকটা শেষ পর্যন্ত ময়দানের দিকে চলে গেল।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, আজ তোমার ওভার টাইম নেই?

—ওভার টাইম থাকলেও আজ আমাকে বাড়ি যেতে হতো। আমাদের বাড়িতে কাল একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। আমাদের বাড়িতে একতলার মেঝে খুঁড়ে একটা মড়ার মাথা পাওয়া গেছে।

অ্যাঁ? কি পাওয়া গেছে?

রীণা মৃদু হেসে বললো, এসো ঘাসের ওপর একটু বসি, বেশিক্ষণ না কিন্তু। বাদাম কেনো না!

সব শুনে সুবিমল বললো, এটা তোমার কাছে মজার ব্যাপার?

রীণা বললো, তাছাড়া কি!

—আমি তো এমন ঘটনা কখনো শুনিনি, বাড়ির মধ্যে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে আর সে বাড়ির বউ বলছে, এটা একটা মজার ব্যাপার। তোমার ভয় করেনি একটুও।

—সত্যি বলতে কি, কাল রাত্তিরে আমার একটু গা ছমছম করছিল। খালি মনে হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে কে যেন আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেলছে।

—তার আগেই মাথার খুলিটা তুমি দেখেছ?

—হুঁ।

—তারপরও তুমি একা ঘরে শুতে পারলে ?

—বাঃ রোজই তো শুই। কালই বা শোবো না কেন ? তাছাড়া কে শোবে আমার সঙ্গে ?

রীণা মুচকি হেসে তাকালো সুবিমলের দিকে। সুবিমল দুঃখিত ভাবে বললো কেন শিপ্রা তো তোমার সঙ্গে শুতে পারতো !

না, শিপ্রার সঙ্গে শুতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। তা'ছাড়া মা একলা থাকবেন কি করে। মাও খুব ভয় পেয়েছেন।

—রীণা, তোমার সত্যিই খুব মনের জোর !

—মনের জোর না থাকলে কি আর এক বাড়ির বৌ হয়েও তোমার সঙ্গে এখানে বসে গল্প করতে পারি ?

—দেবনাথ যদি কোনদিন দেখতে পায়, কি বলবে তুমি তখন ?

—কি বলবো, তখন ভেবে দেখা যাবে। তবে খুব বেশী চেঁচামেচি বা রাগারাগি করার মানুষ ও নয়। চাপা লোক, দুঃখ পেলেও মনের মধ্যে চেপে রাখবে।

—রীণা সত্যি বলছি, দেবনাথের কথা ভাবলে আমার মাঝে মাঝে নিজেকে দারুণ অপরাধী বোধ হয়। ওর উদারতার সুযোগ নিয়ে ওকে ঠকাচ্ছি আমরা।

—বেশ তো কাল থেকে আর ঠকিও না।

- তুমি জানো, সে উপায়ও আমার নেই। তোমারও কি আছে ? তুমি পারবে আমাকে ছেড়ে থাকতে ?

আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে, ময়দানের সব দৃশ্য এখন অস্বচ্ছ। কাছাকাছি আরও কয়েক জোড়া নারী-পুরুষ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। সুবিমল আলতোভাবে রীণার কোমর জড়িয়ে ধরলো, তার নিবারণ বাহুতে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, রীণা, কয়েক শো বছর আগে, তখন তুমি কোনো রাজার পুরীতে পাটরাণী ছিলে, তখন কি তুমি কোনো হাট থেকে আমাকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনেছিলে ?

রীণা সুবিমলের বুকে মাথা হেলিয়ে হাসতে হাসতে বললো,

কিনেছিলাম তো, এক কানাকড়ি দিয়ে কিনেছিলাম।

তাহলে, বলো রাজেন্দ্রাণী, আমার ওপর আর কি হুকুম তোমার? পদসেবা করে দেবো?

—না, আপাতত তোমার বুক পকেট থেকে ফাউণ্টেন পেনটা সরিয়ে নাও। আমার ঘাড়ে ওটাতে লাগছে।

সুবিমল পেনটা সরাতে গিয়ে রীণার ঠোঁটে তার আঙুল ছোঁয়ালো। তারপর মুখটা নিচু করে রীনার চুলের গন্ধ শুঁকাত লাগলো। রীণা ঠোঁটের ওপর থেকে সুবিমলের আঙুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আরও এলিয়ে দিল শরীরটা। সুবিমল রীণার বুকের ওপর রাখলো তার হাত। মুখটা সরিয়ে রীণার ঠোঁটের কাছে আনতেই রীণা ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললো, ইস্, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো বলেছিলুম, দিলে তো দেরি করিয়ে!

—বাঃ, আমি দেরি করিয়ে দিলুম?

—নিশ্চয়ই। তুমিই তো দেরি করলে। চলো, শিগ্‌গির আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে।

—আমি তোমাকে খানিকটা পৌঁছে দিয়ে আসবো?

—না।

শিপ্রা চেঁচিয়ে ডাকলো, মা, মা! তুমি কি করছো ভেতরে?

কোনো সাড়া পেল না। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

শাড়ি সায়া গুছিয়ে শিপ্রা বাথরুমে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, দেখলো মা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন বাথরুমের দিকে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সময় শিপ্রা দেখলো মায়ের মুখখানা কিন্তু একটা চিন্তায় থমথমে! মা কাপড়-টাপড় নিয়ে যায় নি বলে শিপ্রা ভাবলো, মা বোধহয় হাত-টাত ধুতে গেছেন। এক্ষুণি বেরিয়ে আসবেন।

সেই থেকে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। সন্ধে হয়ে এসেছে, শিপ্রাকে এক্ষুণি যেতে হবে গানের ইস্কুলে। পাঁচ

মিনিটের মধ্যেও মা বেরুলেন না। ব্যস্ত হয়ে শিপ্রা আবার ডাকলো, মা, মা, তোমার দেরি হবে?

কোনো উত্তর নেই।

শিপ্রা গুনগুন করে গান ধরলো, 'ওগো, কিশোর আজি তোমার দ্বারে'—এই গানটি শেখানো হচ্ছে এই সপ্তাহে। একটু বাদে শিপ্রা রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বললো, মা তুমি বেরুবে নাকি? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তবু কোনো সাড়া নেই।

বাথরুমের দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিতে যেতেই হাট করে খুলে গেল। ভেতরে নীল আলোটা জ্বলছে। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। পায়খানার দরজাটাও খোলা, সেখানেও কেউ নেই। শিপ্রার বুকের মধ্যে ছাৎ করে উঠলো। সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। মা কোথায় গেল? নিজের চোখে সে মা-কে ঢুকতে দেখেছে। মা তো আর ছেলেমানুষ নয় যে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে তার সঙ্গে খেলা করবে!

তবু শিপ্রা ভয়ে ভয়ে তাকালো দরজার দু'পাশে! দীপু বাড়িতে নেই, বৌদি এখানো ফেরেনি, দাদা শুয়ে আছে ঘরে—মা কোথায় গেল? শিপ্রা একেবারে বাড়ি ফাটানো চিৎকার করলো কান্না মেশানো গলায়, মা! মা!—

—কি রে, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

—শিপ্রা আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বিস্ফারিত। সমস্ত শরীরে শিহরণ। মা তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। মা কখন বেরিয়ে গেলেন বাথরুম থেকে? শিপ্রা তো বরাবর দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। গান গাইবার সময় সে কি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল? এতখানি অন্যমনস্ক?

মা দোতলায় নেমে এসে আবার বললেন, কিরে এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

—মা, তুমি বাথরুম থেকে কখন বেরুলে?

—আমি আবার বাথরুমে গেলাম কখন ?

—তুমি বাথরুমে যাওনি ? আমি দেখলাম !

—যাঃ !

—মা, আমি নিজের চোখে দেখলাম, বিশ্বাস করো।

—আমি তো দীপুর ঘরে আলনা গোছাছিলাম—

বলতে বলতে মা থেমে গেলেন। বাথরুমের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি একবার গিয়েছিলাম।

কিন্তু শিপ্রা তখন আর কিছু শুনছে না। ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলো। তার শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, মা, আমি নিজের চোখে দেখেছি—এমন কি মুখ পর্যন্ত।

দেবনাথ বোধহয় ঘুমিয়েই ছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে বললো, কি হয়েছে কি ? এত জোরে জোরে কথা বলছিস কেন শুধু শুধু ?

—দাদা আমি দেখলাম।

মা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, হয়েছে, হয়েছে ! শিপ্রা চোখে কি ভুল দেখেছে।

—না, চোখের ভুল নয় ! ভুল হতেই পারে না।

—যা, তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নে, গানের স্কুলে যাবি না ?

—মা, দেখ আমার গা কাঁপছে। আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করছে। আমাকে একটু ধরো তো—

মা ধরার সুযোগ পেলেন না, দেবনাথও ছুটে এসে ধরতে পারলো না, তার আগেই শিপ্রা নেতিয়ে পড়ে গেল মাটিতে, মাথাটা বেশ জোরে ঠুকে গেল মাটিতে।

মা ছুটে ওর মাথাটা তুলে নিলেন। দেবনাথ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি ওর একটা হাত তুলে মণিবন্ধ টিপে নাড়ি দেখতে লাগলো। বিশেষ কিছুই হয়নি, এমনি অজ্ঞান হয়ে গেছে ! মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে।

দেবনাথ বললো, মা, ছাখো, ওকে বোধ হয় তোমার রোগটা ধরলো।

—না, মৃগী নয়! হঠাৎ ভয় পেয়েছে। শ্রী রাম রাম রাম। কি যে অনাবৃষ্টি হল বাড়িটায়।

—ভয় পেয়েছে? এখনো সাড়ে ছ'টাও বাজে নি। অন্ধকার হয়নি ভালো। কিসে ভয় পেল?

—কি জানি! আমি তিনতলা থেকে নেমে এসে দেখি বাথরুমে সামনে দাঁড়িয়ে মা মা বলে চ্যাচাচ্ছে। ও নাকি আমাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখেছে। অথচ আমি তু'ঘণ্টার মধ্যে বাথরুমে যাই নি। এক মগ জল নিয়ে আয় তো?

—হুঁঃ, বুঝলাম! পেট গরম হয়েছে! তা হবে নাই বা কেন? যা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ায়। কদিন আগে বাসে আসবার সময় দেখলাম কলেজ পালিয়ে আর তু'তিনটে মেয়ের সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরছে, যা গণগনে রোদ্দুর তখন, আমাদেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত, আর ওরা শখ করে—

রীণা যখন ফিরলো, তখনও শিপ্রা ভালো করে সুস্থ হয়নি। ঘরে এনে খাটে শোয়ানো হয়েছে, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে ব্যাকুল ভাবে বলছে, কিন্তু আমি যে দেখলাম বাথরুমের আলো জ্বলছে। আলো জ্বাললো কে?

দেবনাথ ব্যাপারটা হালকা করার জন্য বললো, যা, যা ভূত কখনো আলো জ্বালে না। আমিই হয়তো কখন আলো জ্বেলে রেখে এসেছি!

—তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে?

—ঘুমের ঘোরেই কখন হয়তো একবার উঠে চলে গিয়েছিলাম। তুই আমাকেই দেখিস নি তো?

—না, না আমি মুখ পর্যন্ত দেখেছি।

বলেই আবার উঠে বিছানায় ঢলে পড়লো শিপ্রা। রীণা ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুত্ব দিলো না। চুপচাপ করে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে একটু দেখলো। মা প্রাণপণে ঠাকুরের সামনে ধুপ-ধুনো

দিচ্ছেন। রীণা ঘর থেকে বেরিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে চলে এলো নিজের ঘরে। তার পরই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

শিপ্রা আর একবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললো, আমি গানের স্কুলে যাবো।

মা ঠাকুরের ছবির সামনে বিড়বিড় করে কি যেন .বলছিলেন। মুখ ফিরিয়ে বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন, না, আজ আর বাইরে বেরুতে হবে না।

দেবনাথও বললো, একদিন গান শিখতে না গেলে কি হয়?

শিপ্রা আবার শুয়ে চোখ বুঝলো। এবার আর সে অজ্ঞান হয় নি, এমনিই চোখ বুজে রইলো।

আর ওদিকে, শিপ্রার গানের স্কুলের উল্টোদিকে বকুল গাছটার তলায় অনবরত পায়চারি করতে লাগলো রমেন! অনবরত ঘড়ি দেখছে আর তাকাচ্ছে বাসস্টপের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ আর ঘাড় ব্যাথা হয়ে এলো।

পাড়ার লাইব্রেরীতে 'গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র' এই বিষয়ে বিতর্ক ছিল। দীপু সেখানে জোবালো গলায় সর্বহারার একনায়ক-তন্ত্রের সমর্থনে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। বাড়ি ফিরলো সাড়ে ন'টার সময়। সমস্ত বাড়িটা তখন থমথমে—যদিও সব কটা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

শিপ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে, এ ছাড়া আর কিছু খেতে চায় নি। সব শুনে দীপু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, ভূত-টুত সব বাজে কথা। বাড়িতে মানুষের হাড় পাওয়া গেছে তো, তাই এখন অনেকে অনেক কিছু ভাববে। কিন্তু বাড়িটার একটা কিছু রহস্য আছে, আজ বাড়িতে ঢোকার সময়ও কি রকম গা ছম্‌ছম্‌ করলো।

বারান্দায় খাবার দেওয়া হয়েছে। দু'ভাই আর রীণা খেতে বসেছে। মা একটা চেয়ার টেনে এমনিই বসে আছেন দূরে। শোবার ঘরের দরজা খোলা, বিছানাব ওপর শুয়ে থাকা শিপ্রাকে

স্পষ্ট দেখা যায়, মা চোখ রেখেছেন সেদিকে। মা বললেন, তোরা তো বিশ্বাস করিস না এসব। আমার বিয়ের পর, তোদের এক সম্পর্কের কাকা—তোর বাবার পিসতুতো ভাই, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাবা, বাবা, আমি যাচ্ছি! আমি যাচ্ছি! তারপর সারাক্ষণ চেঁচাতে লাগলো ঐ কথা বলে, এমনভাবে চেয়েছিল যেন ঠিক কারুকে দেখতে পাচ্ছে—কত ডাক্তার ডাকা হলো। তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজ গণনাথ সেনকেও ডাকা হয়েছিল—কিন্তু তিনদিনের দিন তোদের সেই কাকা মারা গেলেন।

দেবনাথ বললো, তুমি চুপ করো তো! যতসব বাজে বাজে গল্প বলে আরও ভয় ধরিয়ে দেওয়া।

রীণা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কার ভয় ধরবে? তোমার?

দেবনাথ বললো, তুমিই তো ভয় পাবে! রাত্তিরে বাথরুমে যাবার সময় আমাকেই ডাকবে।

—কোনোদিন ডেকেছি?

—দেখবো আজ কি হয়!

রীণা মুখের হাসিটি অম্লান রেখেই বললো, আমার ভূতের গল্প শুনতে ভালো লাগে! কিন্তু ভূতের ভয় করে না।

—দেখা যাবে!

দীপু বললো, অনেকে অনেক রকম ভুল দেখে—কিন্তু শিপ্র মাকে ভুল দেখলো কি করে! ভূতের গল্পেও তো কখনও ভূতেরা জ্যান্ত মানুষের চেহারা ধরে আসে না?

দেবনাথ বলসে, এও এক ধরণের আটো সাজেসশান। শিপ্রা হয়তো কোনো কারণে মা-কে ভয় পাচ্ছে—

দেবনাথ আর যেটুকু বলতে চাইলো, তা হচ্ছে এই যে শিপ্রা হয়তো মা'র কাছে এমন কিছু গোপন করে আছে—যা ধরা পড়ে গেলে মা ভয়ংকর রাগ করবেন।—কিন্তু ছোট ভাইয়ের সামনে একথা আর বলবো না।

খাওয়া শেষ হবার পর সবেমাত্র হাত ধুয়েছে ওরা, এমন সময়

মাথার ওপর গুম্‌গুম্‌ শব্দ হলো।

দীপু গম্ভীর গলায় বললো, মেঘ ডাকছে। রাত্তিরে নিশ্চয়ই দারুণ বৃষ্টি হবে।

মা ভয়ার্তগলায় বললো, মেঘ কোথায়? এতো ছাদে শব্দ হচ্ছে। ও দেবু, ও দীপু—

আর একবার শব্দ হলো, যেন ছাদের ওপর দিয়ে কেউ একটা লোহার বল গড়িয়ে দিচ্ছে।

মা আবার চিৎকার করতে যেতেই দেবনাথ বললো, দাঁড়াও, আগে থেকেই অত ব্যস্ত হয়ো না। ভালো করে শুনতে দাও।

রীণা বরোন্দায় গিয়ে ওপরের দিকে উঁকি মেরে বললো, আকাশে একটুও মেঘ নেই।

দীপু বললো, গরমের দিনে ছাদে এরকম শব্দ হয়। দিনেরবেলা প্রচণ্ড উত্তাপে সব কিছুই একটু বেড়ে যায, রাত্রিরে ঠাণ্ডা পেয়ে যখন আবার কমতে শুরু করে তখন ঐরকম শব্দ হয়।

—আগে আর তো কখনো শুনিনি?

—শুনেছো নিশ্চয়ই। তখন গ্রাহ্য করো নি। ঠিক আছে আমি দেখে আসছি।

দীপু সিঁড়িতে উঠতে যেতেই মা বললেন, না, তুই একা যাবি না। খবর্দার দীপু বারণ করছি—

রীণা দেবনাথকে বললো, তুমিও যাও না? চলো আমিও যাচ্ছি।

দেবনাথ বললো, তুমি নিচে থাকো মায়ের কাছে। আমি যাচ্ছি।

দীপুই আগে উঠে এলো। তিনতলায় তার একখানা ঘর, বাকিটা ছাদ। আবছা জ্যোৎস্নায় পুরো ছাদটা ফাঁকা পড়ে আছে। নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার ঘর খোলা। দরজার কাছে শাড়ি পরা একটা আবছা নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে।

এক মুহূর্তের জন্য দীপুর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো।—চিৎকার করতে গিয়েও মুখ চাপা দিল। অস্ফুটভাবে জিজ্ঞেস করলো, কে?

নারীমূর্তি একবার যেন নড়ে উঠলো। কোনো সাড়া দিল না।

দীপু স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে দু'পা এগিয়ে যেতেই তার সমস্ত শরীরটা আবার হাল্কা হয়ে গিয়ে, কুলকুল করে ঘাম বইলো।

দূর ছাই, কেউ না, দরজার পর্দাটা হাওয়ায় উড়ে ঐ রকম দেখতে হয়েছিল। ঠিক যেন টাইটভাবে শাড়ি পরে একটি মেয়ে, নবনীতার মতন। ইস্, এইরকম ভাবেই মানুষ ভয় পায়। তার নিজের পর্যন্ত এইরকম ভুল হয়েছিল। অবিকল মনে হয়েছিল নবনীতার মতন—এমনকি অসম্ভব হলেও তার একবার মনে হয়েছিল, নবনীতাই বুঝি কোনো রকমে এসে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

পেছন থেকে দেবনাথ বললো, কিরে ?

দীপু আলগাভাবে হেসে বললো, কই কিছু না।

দু'ভাই সারা ছাদটা ঘুরে দেখলো। এমন কি জলের ট্যাঙ্কের পাশে উঁকি দিতেও ছাড়লো না—যদি ভূত ওদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। কোথাও কিছু নেই। ট্যাঙ্কের পাশে কয়েকটা ফুলের টব, একটা খালি টব কাৎ হয়ে পড়ে আছে। সেটা গড়াবার জন্যই কি শব্দ ? কিন্তু তাহলে সারা ছাদ জুড়ে শব্দ হবে কেন। ওসব কিছু নয়।

রীণা আর মা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, কিন্তু দু'জনেই নিঃশব্দ।

বছর খানেক ধরে দু'জনে পরস্পর কথা বলে না। অন্যদের সামনে অবশ্য সেটা বুঝতে দেয় না, রীণা প্রয়োজনীয় দু'একটা কথা বলে মার সঙ্গে। কিন্তু একা থাকলে কোনো কথা নেই।

দু'ভাই নেমে এলো একসঙ্গে। রীণা দীপুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কিছু দেখতে পেলে ?

দীপুও হেসে উত্তর দিল, না বৌদি, ভূতেরা দারুণ কাওয়ার্ড। কিছুতেই সামনাসামনি আসে না। অন্তত আমার সামনে কখনো আসে নি।

মা আজ তিনতলায় দীপুকে কিছুতেই শুতে দেবেন না। দীপু শোবেই। দোতলায় আর একটা মাত্র ঘর আছে, সেটা মালপত্রে ঠাসা তা ছাড়া সে ঘরটায় মাত্র একদিকে জানলা বলে ভালো হাওয়া খেলে না। একা ঘরে শোয়া অভ্যেস, মা আর শিপ্রার সঙ্গে

এক ঘরে সে কিছুতেই শোবে না।

দেবনাথ বললো, শুক না ওপরে। এতদিন ধরে শুচ্ছে কিছু হয় নি—ওরকম বেশী বেশী করলে ভয় আরও পেয়ে বসবে তোমাদের।

মা শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করলেন, দীপু তবুও শুনলো না। এ বংশের ছেলেরা বড় গোঁয়ার।

দীপু বললো কাঞ্চা তো সঙ্গেই আছে—তা হলে আর একা শোয়া হলো কোথায়?

কাঞ্চা আর কুকুরটাকে নিয়ে দীপু ওপরে উঠে গেল।

দেবনাথ নিজের ঘরে ঢোকার আগে মাকে বললো, ভালো করে দরজা বন্ধ করে শুয়ো। ভয়ের কিছু নেই। যদি কোন কিছু হয়—আমাকে ডেকো কিন্তু!

রীণা তখনও বাথরুমে। তার চাপা গলার গান পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এই বাথরুমেই শিপ্রা আজ ভয় পেয়েছিল—রীণার সে সব ভ্রূক্ষেপ নেই। শোয়ার আগে গা না ধুলে তার চলে না।

পাতলা নাইটি পরে বাথরুম থেকে বেরুলো রীণা, একবার নিচের উঠোনের অন্ধকারের দিকে, একবার ছাদের দিকে চেয়ে—কিছুই দেখতে পেল না; ঘরে এসে ঢুকলো।

দেবনাথ একটা বই নিয়ে সিগারেট টানছে শুয়ে শুয়ে। দুপুরে অনেক ঘুমিয়েছে। এখন সহজে ঘুম আসবে না। এক সপ্তাহ অন্তর নাইট ডিউটি থাকে বলে যে-কটা রাত্রে সে বাড়িতে ঘুমোয়, সেই কটা রাতই তার ইচ্ছে করে রীণার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করতে। অন্যদিন রীণা দুপুরে অফিস যায়। সন্ধের পর যখন ফেরে তার একটু বাদেই দেবনাথকে অফিস চলে যেতে হয়। বউয়ের সঙ্গে কথাই হয় না প্রায়।

দেবনাথ আড়চোখে দেখছে রীণার পাউডার ও ক্রিম মাখা। প্রত্যেকদিন সে প্রায় একই রকমভাবে প্রসাধন করে, দেবনাথ বাড়ি থাক বা না থাক তার শেষ হয়ে গেলে সে দেবনাথকে জিজ্ঞেস করলো, আলো নেভাবো, না তুমি পড়বে?

দেবনাথ বললো, আর পড়বো না, কিন্তু আলোটা থাক।

মস্ত বড় খাট, অঢেল জায়গা, রীণা এসে একটু দূরে শুতেই দেবনাথ হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁলো। ঘাড়ের তলায় হাত ঢুকিয়ে টেনে আনলো তাকে কাছে। বুকের ওপর আলতোভাবে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে আজ একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?

—কই গম্ভীর না তো! তোমার ঘুম পায়নি?

—না।

দেবনাথের ইচ্ছে হলো, রীণার ঠোঁটে একটা চুমু খায়। কিন্তু অনেকখানি ক্রিমে ঠোঁট দুটো চটচটে হয়ে আছে। রীণার বুকে সামান্য চাপ দিয়ে বললো, বাথরুমে এতক্ষণ ছিলে, তোমার ভয় করে নি?

—ভয় আবার কি?

—সব মেয়েরাই তো একটু একটু ভূতের ভয় পায়।

—আমি পাই না। আমি সারা জীবন মানুষকেই এত ভয় পেয়েছি! আজ ও একটা লোক—

—আজ আবার কি হলো?

আজ অফিসের গেটের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল—আমি যেখানেই যাই—আমার পেছন পেছন আসতে লাগলো।

—অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে।

—কোথায় আবার যাবো। বাস-স্টপে এলাম—সেখানেও লোকটা, পর পর ক'টা বাস ছেড়ে দিলাম, তবুও দাঁড়িয়ে রইলো।

—লোকটাকে আগে কখনও দেখেছো?

—না। আমার এমন ভয় করছিল--

—ওরকম বাজে লোক অনেক ঘোরে এসপ্ল্যানেড পাড়ায়।

—বিয়ের আগে তুমিও আমার পেছন পেছন আসতে।

দেবনাথ হেসে বললো, আমিও তাহলে বাজে লোক। তুমি আমাকে ভয় করো।

রীণা বললো, আমার দুর্ভাগ্য কিনা বলতে পারি না—অনেক

ছেলেবেলা থেকেই আমার পেছন পেছন এ রকম একটা না একটা লোক ঘুরছে। তার মধ্যে তোমাকেই আমি শুধু বিয়ে করেছি।

—আমাকে বিয়ে করাটাও বুঝি দুর্ভাগ্য ?

—তাই বললাম নাকি ? বললাম তাদের মধ্যে শুধু তোমাকেই ভালো লেগেছিল বলে তোমাকে বিয়ে করেছি।

—লেগেছিল ? এখন আর লাগে না ?

—তুমি সাংবাদিক হলে কেন ? উকিল হলেই পারতে ?

দেবনাথ আবার হেসে রীণাকে আর একটু কাছে টেনে আনলো। রীণা বাধা দিল না, নিজে থেকে জড়িয়েও ধরলো।

দেবনাথ বললো, বাড়ীতে যা শুরু হয়েছে, বাড়িটা বিক্রী করে দেওয়াই ভালো মনে হচ্ছে।

—বাঃ ভূতের ভয়ে বাড়ি বিক্রি করে দেবে কেন। তাহলে তো আমার অফিসের গেটে লোক দাঁড়িয়ে থাকে বলে আমাকেও অফিস ছেড়ে দিতে হয়।

—কিন্তু খুকু ওরকম ভয় পেল কেন ?

—এবার খুকুর বিয়ে দিয়ে দাও। ওর যে আর লেখাপড়া হবে না, তা তো বুঝতেই পারছো।

—কার সঙ্গে ঐ রমেনের সঙ্গে ? জুতিয়ে ওর মুখ ভেঙে দেবো একদিন, রাস্কেল একটা। কাজ নেই, কর্ম নেই, শুধু মেয়েদের পেছন পেছন ঘোরা।

—মেয়েদের নয়, আমি যদ্দুর জানি, শুধু শিপ্রার পেছনেই ঘোরে !

—তাই বা ঘুরবে কেন ? এখনও কোনো চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে নি। বরং চাকরির জন্য ঘুরলে কাজ দিত !

—তুমি যখন আমাকে ফলো করতে, কখন তোমারও কোনো চাকরি ছিল না।

দেবনাথ এবার রীতিমত চটে উঠলো। স্ত্রীর শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, রীণা, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো ! তুমি আমার সঙ্গে তুলনা করছো ঐ লোফারটার ?

রীণা এবার নিজে থেকে হাত রাখলো দেবনাথের গায়ে। ঠোঁট থেকে ক্রীম মুছে একটা চুমু দিল দেবনাথের কপালে। কোমল গলায় বললো, তুমি রাগ করছো? আমি কিন্তু তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কিছু বলিনি! আমি বলছিলাম, আমরা নিজেরা যখন কারুকে ভালোবাসি—তখন নিজেদের পক্ষে অনেক রকম যুক্তি তৈরী করি—কিন্তু অন্যদের বেলায় তা সইতে পারি না শিপ্রা যখন রমেনকে ভালোবাসে—

—মোটেই না। ও এমনি চোখের ভালোবাসা! আমি কিছুতেই ঐ রাস্কেলটার সঙ্গে খুকুর বিয়ে দেবো না।

—ঠিক আছে মাথা গরম করো না, এখন ঘুমোও!

—আমার ঘুম পায়নি। তুমি ঘুমোও!

—তুমি এখনো রাগ করে আছো? তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না?

ভালোবাসা? হুঁ তুমি কত ভালোবাসো, জানা আছে!

রীণা একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেললো। দেবনাথের একেবারে বুকের কাছে ঘেঁসে এলো, মিশে গেল দু'জনের বুক। জোর করে দেবনাথের মাথাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফিসফিস করে বললো, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে দারুণ ভালোবাসি। প্রাণের মতন ভালোবাসি এর মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই! আমার যখন মন খারাপ হয়, আমার যখন একঘেয়ে লাগে—তখন আমি একথা খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি! তোমাকে ভালো না বাসলে আমি অনেক কিছুরই কারণ খুঁজে পেতাম না। তুমি যে এত ভালো, তোমাকে ভালো না বেসে উপায় কি?

রীণার কথায় অত্যন্ত আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। দেবনাথ খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়লো। আবিষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলো, সত্যি বলছো?

—এর থেকে সত্যি কথা আর কখনো বলিনি।

চুমুতে চুমুতে দেবনাথের মুখ আচ্ছন্ন করে দিল রীণা। দেবনাথ

ফের রীণার ওপর এক হাত রেখে অন্য হাতে নাইটিটা গা থেকে সরাতে গেল। রীণা সেটা চেপে ধরে বললো, আজ নয়, লক্ষীটি আজ আমার শরীর খারাপ।

দেবনাথ বললো, ঠিক আছে, তাহলে আলো নিভিয়ে দাও!

গরমের জন্য দরজা খুলে শুয়ে আছে দীপু। কাঞ্চা মেঝেতে শুয়ে ফিসফিস করে নাক ডাকছে আস্তে আস্তে। কুকুরটা শুয়ে আছে সিঁড়ির ওপর। সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কুকুরটা দুবার ডেকে উঠতেই ধড়মড করে উঠে বসলো। কুকুরটা ছাদের ওপর কাকে যেন তাড়া করে গেল। দীপু তৈরী হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে খাটের পাশ থেকে টর্চটা নিয়েই বেরিয়ে এলো। ছাদে কেউ নেই, কুকুরটা তবুও যেন কাকে তাড়া করে ছুটেছে।

তবে কি সত্যিই অশরীর কিছু? কুকুররা কি অশরীরদেরও দেখতে পায়।

আবছা জ্যোৎস্না উঠেছে, চতুর্দিকে নির্জন, মনে হয় গোটা শহরটাই এখনই ঘুমন্ত। দীপুর হঠাৎ মনে হলো, এখানে সে বড্ড একা। অনিচ্ছা সত্বেও গা ছম্‌ছম্‌ করছে। একবার ভাবলো কাঞ্চাকে ডাকবে কিনা। কুকুরটা তখনও কি একটা অদৃশ্য জিনিসকে তাড়া করছে সারা ছাদময়, মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে কুঁই কুঁই। দীপু দু'বার ডাকলো, লিজি! লিজি! শোন এদিকে। কুকুরটা তার ডাকে পাত্তাই দিল না।

টর্চের আলোটা আবার ভালো করে ফেলতেই দীপু দেখতে পেল, একটা ধেড়ে ইঁদুর। কুকুরটা ইঁদুরটাকেই তাড়া করছে। এতক্ষণ দীপু আলোছায়ার মধ্যে ওটাকে দেখতে পায়নি। দীপু হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারলো না। ছি, ছি, ছি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস সত্বেও সেও তো একটু একটু ভয় পেয়েছিল। নির্জন রাত্তিরে সামান্য কারণেই বিশ্বাস টলে যায়।

দীপু আবার নিজের খাটে ফিরে এলো। কিন্তু ঘুম আর এলো না ভয় ভাঙার জন্য দীপু তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। তাকিয়ে

তাকিয়ে তার চোখ ব্যাথা হয়ে গেল, কিছুই দেখতে পেল না, শুধুই জ্যোৎস্না পড়ে আছে ম্লান ভাবে।

দরজার নীল পর্দাটা উড়ছে হাওয়ায়। সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এই পর্দাটাকেই কিছুক্ষণ আগে তার নবনীতা বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু নবনীতাকে দেখলে তার ভয় পাবার কি আছে? নবনীতা তো জলজ্যান্তভাবেই বেঁচে আছে।

খাট থেকে উঠে দীপু একটা সিগারেট ধরালো। আপন মনেই সামান্য হাসলো। নবনীতাকে আর একবার দেখা গেলে মন্দ হতো না! এমনিতে তো আর নবনীতার সঙ্গে দেখা হয় না, তবু যদি দৃষ্টি বিভ্রমে দেখা যেত!

সপ্তাহ দু'এক আগে নবনীতার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল, তখন দীপু মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। নবনীতাকে দেখে তার গা জ্বলে গিয়েছিল। মেয়েদের কখনো বিশ্বাস. করতে নেই। এই নবনীতাই একদিন তাকে বলেছিল, অরুণাংশুকে দেখলে তার গা জ্বলে যায়। গায়ে-পড়া ন্যাকা ছেলে, নেহাত বাবার টাকা আছে আর একটা পুরোনো আমলের অস্টিন গাড়ি আছে তাই নিয়ে খুব চাল মেরে বেড়ায়। পাক্কা ক্যাপিটালিস্টের বাচ্চা।

অথচ সেই নবনীতাকেই দীপু দেখেছে অরুণাংশুর গাড়িতে চেপে রেড রোড দিয়ে যাচ্ছে। দীপু তখন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের মিটিং-এ যাচ্ছিল। গাড়িতে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না, নবনীতা বসেছিল সামনের সিটে, কি একটা হাসির কথায় সে আর অরুণাংশু হেসে কুটি কুটি হচ্ছিল। কে জানে অরুণাংশুর একটা হাত নবনীতার উরুতে রাখা ছিল কিনা। কিছু বিশ্বাস নেই। নবনীতা যখন অমনভাবে হাসতে পারে—

সে দন ভূত দেখার মতনই চমকে গিয়েছিল দীপু। যতদূর দেখা যায় গাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর অসম্ভব ক্রোধে তার শরীর একেবারে জ্বলে গিয়েছিল। সেদিন মিটিং-এ একটা কথাও তার কানে ঢোকে নি। প্রথমে সে ভেবেছিল, দু'তিনজন বন্ধুকে

সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অরুণাংশুকে বেদম ধোলাই দেবে। অবশ্য অরুণাংশুকে মারতে হলে বন্ধুদের সাহায্যের দরকার নেই, সে একাই যথেষ্ট। কিন্তু খানিকটা বাদে, তার আবার মনে হয়েছিল, এক্ষেত্রে অরুণাংশুর কি আর দোষ! যে বড়লোকের বখাটে ছেলে সে তো নবনীতার মতন সুন্দরী মেয়ের পেছনে ছোঁক ছোক করবেই। নবনীতা তার কাছে মিথ্যে কথা বললো কেন? নবনীতা কেন তাকে এরকম কথা বলে আবার অরুণাংশুর গাড়িতে চাপলো? অত হাসি বা কিসের?

দীপু সেদিন ঠিক করেছিল, শুধু নবনীতা নয়, পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে সম্পর্ক রাখবে না। মেয়েরা সবাই এরকম। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম-ফ্রেম করাই এক ঝামেলা। এক গাদা সময় নষ্ট, কত রকম ন্যাকামি যে সইতে হয়—তার ওপর যদি এরকম অবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়—

আজ ছাদে উঠে প্রথমবার নীল পর্দাটা দেখে তার বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। ঠিক মনে হয়েছিল নবীনতা দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যেই একটা নম্র সলজ্জ ভাব। যেন নবনীতা তার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে। দূর! তাও কি হয় নাকি! নবনীতা এ বাড়িতে আসেই নি কোনদিন। তিন-তলায় সোজা উঠে আসা তো অসম্ভব কথা। একদিন শুধু গলির মোড় থেকে নবীনতাকে তাদের বাড়িটা দেখিয়েছিল দীপু।

কিন্তু পর্দাটাকে নবনীতা বলে মনে হলো কেন তার। সে তো ক'দ্দিন ধরেই নবনীতার কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীপু চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো। হঠাৎ তার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। ক'দিন ধরে তার মন জুড়ে ছিল শুধু রাগ। এখন আর রাগ হচ্ছে না পৃথিবীর কারুর ওপর, শুধু অভিমান। পৃথিবীর কেউ তার কথা ভাবে না। নীল পর্দাটার দিকে আর একবার তাকিয়ে দীপু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললো।

—ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো শিপ্রা। মুখে হাত দিয়ে

সামলাবার চেষ্টা করলো, পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে একবার ছুটে গেল দরজার দিকে, দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়েও তার ভয় করলো। ফিরে এলো জানলার নিচে নর্দমার কাছে। হুড়হুড় করে বমি করতে লাগল।

একটু আধটু বমি নয়, একেবারে পেট খালি করা। রাত্তিরে কিছুই খায় নি, দিনের বেলায় ভাত তরকারি পর্যন্ত উঠে এলো বমির সঙ্গে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে বমি করলো শিপ্রা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, চোখে অন্ধকার দেখছে, মা-কে ডাকতেও সাহস হলো না। কোন রকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। খুট করে আলো জ্বেলে দেখলো, বেড সাইড টেবিলে এক জগ জল ঢাকা দেওয়া রয়েছে। জলটা আনতে গিয়ে তার পা টলে গেল, তাড়াতাড়ি সামলে নিল খাটের পায়া ধরে। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই।

শিপ্রা আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে জলের জগটা নিয়ে ফিরে এলো নর্দমার কাছে। ভালো করে চোখ মুখ ধুলো। মা যাতে বুঝতে না পারে, সেই জন্য জল ঢেলে বমি ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলো মেঝে থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না, বারবার তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, মাথা ঘুরে যাচ্ছে। এখন শুয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

খাটের কাছে ফিরে এসে শরীরটাকে হিঁচড়ে বিছানায় তুললো। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, মায়ের মুখে একটা বিষণ্ণতার ছায়া। অবিকল এই রকম মুখই সে দেখেছিল সন্ধ্যেবেলা বাথরুমের দরজার কাছে।

ইস্, আলো নেভানো হয় নি। আবার নামতে হবে? কিন্তু শরীর আর বইছে না। এর মধ্যেই গলা শুকিয়ে আবার তেষ্টা পেয়েছে, পেটের মধ্যে গুলোচ্ছে কোমরের কাছটায় আর পিঠে অসহ্য ব্যথা। আলো জ্বালা সত্ত্বেও চোখের সামনে সব কিছু এক

একবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

শিপ্রার দারুণ ভয় হলো, সে ভাবলো, মানুষ মরে যাবার আগে কি এরকম হয়? আমি কি মরে যাচ্ছি! আমার মরণই ভালো। আমি আগেই আত্মহত্যা করলুম না কেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বেঁচে থাকার দারুণ ইচ্ছে হলো। একবার হাত বাড়িযে মাকে ডাকতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। সারাদিনে মায়ের অনেক খাটুনি যায়—এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, এখন ডাকা উচিত হবে না। শিপ্রা বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এক সময় কান্না থেমে গেল তার। একটা কথা মনে পড়লো, একতলার ঘরের মেঝে খুঁড়ে যে মেয়েটার কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল, সে কি আত্মহত্যা করেছিল? তার অবস্থাও কি শিপ্রার মতো হয়েছিল? সে কি এখন শিপ্রাকে টানছে? কাল থেকেই তার আত্মহত্যার কথা মনে হচ্ছে।

কি একটা আওয়াজে শিপ্রা উৎকর্ণ হয়ে উঠলো, চোখ মুছে ভালো করে শোনার চেষ্টা করলো। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে কে যেন নামছে। দরজা বন্ধ, বাইরের সামান্য পায়ের আওয়াজ শিপ্রার শুনতে পাবার কথা নয়, কিন্তু চারিদিক এত উৎকট নিস্তব্ধ যে পিঁপড়ের চলার আওয়াজও যেন শুনতে পাওয়া যাবে।

শব্দটা ক্রমশ জোর হচ্ছে। এবার আর কোনো ভুল নেই। ঘড়িতে আড়াইটে বাজে, এখন কে নামবে সিঁড়ি দিয়ে! শিপ্রা সোজা হয়ে বসলো। পায়ের শব্দটা এ ঘরের দিকেই আসছে, খুব কাছে।

শিপ্রা আর থাকতে পারলো না, দু'হাতে মা-কে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো মা, মা, শিগগিরি—

মা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন।

ঐ যে শোনা পায়ের শব্দ। শিপ্রার চুলগুলো এলোমেলো,

চোখ দুটো ড্যাবড্যাবে, আঁচল খসে পড়েছে।

মায়ের ঘুমের ঘোর ভালো করে ভাঙে নি। তিনি বললেন, কোথায় শব্দ? কিছু না তো! তুই ঘুমো।

—ঐ যে ঐ যে শোনো।

—কই শুনতে পাচ্ছি না তো! আলো কে জ্বাললো।

—মা, এসে পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়লো। মা আর শিপ্রা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। শিপ্রার গলা দিয়ে চিৎকারও বেরুচ্ছে না, একটা অদ্ভুত চাপা ভয়ের বিকৃত আওয়াজ বেরুচ্ছে।

—দরজা খোলো, আমি দীপু!

শিপ্রা আর্তনাদ করে উঠলো, না, মা, দরজা খুলো না, খুলো না! ছোড়দা নয়! এবার ছোড়দার রূপ ধরে এসেছে।

—দরজা খোলো না!

—মা খুলো না, খুলো না!

মা খাট থেকে নেমে দরজার কাছে এসেছেন, দরজা খুললেন না। হাত জোড় করে বললেন, তুমি কে বাবা, সত্যি করে বলো! আমরা তো কোনো দোষ করি নি।

—বলছি তো আমি দীপু।

—এত রাত্তিরে কি চাস?

—শিপ্রার ঘাড় মটকাবো!

মা দরজা খুলে দিলেন। দীপুর চেহারা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, চুলগুলো কপালের ওপর ছড়ানো, চোখ দুটো জ্বলছে। ভয়ংকর বিকৃত গলায় সে বললো, শিপ্রাকে চাই। শিপ্রার ঘাড় মটকাবো!

মা আর শিপ্রা দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে যাবার ঠিক আগেই দীপু হা—হা করে হেসে উঠলো। হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিল কপাল থেকে। বললো, কি, ভয়ে একেবার মরছিলে তো?

মা ভয়ংকর রাগ করে বললো, ছাখ দীপু, সব ব্যাপারেই

ছেলেমানুষী, না? জানিস্ অনেকে এতে হার্টফেল করে।

দীপুর হাসি তবু থামে না!

মা সেই রকম ক্রুদ্ধভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্তিরে কি চাই তোর?

—জল তেষ্টা পেয়েছে। আমার ঘরে জল রাখোনি কেন?

—এত রাত হয়েছে যখন, সকালবেলা জল খেলে চলতো না?

দেখলাম তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে। জল না খেলে আমার ঘুম আসবে না।

জলের জগটা আনতে গিয়ে মায়ের চোখে পড়লো মেঝের ওপর ছড়ানো বমি। অস্ফুটভাবে বললেন একি! আর কিছু বললেন না! দীপুকে এক গেলাস জল গড়িয়ে এনে দিলেন।

দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। দীপু চলে যাবার পরও সে সেই রকম ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো। তখনও তার ঘোর কাটে নি। মা দরজা বন্ধ করে শিপ্রার দিকে ফিরলেন।

শিপ্রা শুধু বললো, মা—আর কিছু বলতে পারলো না। আবার মা'র মুখে গাঢ় অন্ধকার ছায়া। শিপ্রার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কি হয়েছে? এত বমি করেছিস কেন? কি হয়েছে আমাকে বলতো?

উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছলো শিপ্রা। এবার অনেকখানি সুস্থ লাগল তার। মুখ নিচু করে বললো, মা, আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারবো না!

—কেন? তুই একাই এত বেশী ভয় পাচ্ছিস কেন?

—আমার সব সময় ভয় করছে। আর পারছি না।

—তুই তাহলে কাল থেকে তোর ছোট মাসীর বাড়িতে গিয়ে ক'দিন থেকে আয়।

—ছোট মাসীর বাড়িতে গেলেও আমার সারবে না। মা, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—কেন রে? কেন? এই খুকু—

শিপ্রা প্রায় ছুটে এসে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো। ফুলে ফুলে উঠেছে তার সুন্দর সুঠাম শরীরখানি। মা বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কি হয়েছে কি? আমাকে বল্—

· মা, আমাকে রমেনকে বিয়ে করতে দাও।

–রমেন! আবার সেই রমেন! কেন, সে ছাড়া অন্য ছেলে নেই?

—ছোটদা রমেনকে অপমান করেছে। কিন্তু রমেনকে ছাড়া আমার চলবে না!

—কেন, রমেন কেন? রমেন কি এমন ছেলে? তোর ছোট মাসী যে ছেলেটির খবর এনেছে, সে তো চমৎকার পাত্র। চেহারাও সুন্দর, ইঞ্জিনিয়ার; ভালো চাকরি করছে।

—মা, অন্য কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়?

–মা, আমি দারুণ ভুল করে ফেলেছি। তোমরা এখন যদি বেশী বাধা দাও আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—কি করেছিস? কি করেছিস?

শিপ্রা কাঁদতে কাঁদতেই একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললো। মায়ের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল। খুব ক্লান্ত ভাবে থেমে থেমে জিজ্ঞেস করলেন শুধু ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ। তোমরা যদি চাও আমি আত্মহত্যা করলেই সব মিটে যায়, তাহলে সত্যিই আমি—

মা এবার ধমকে দিয়ে বললেন, এখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড় তো? আর শরীরটাকে খারাপ করতে হবে না!

আলো নেভাবার পর অবশ্য দু'জনের কারুরই ঘুম হলো না। মা আর শিপ্রা কথা বলতে লাগলো রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

পরদিন পুরুত ডাকিয়ে খুব ধুমধাম করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন হলো।

মা সেই পুরুতকেই বললেন খুব কাছাকাছি একটা বিয়ের তারিখ দেখতে দেবনাথকেও সব খুলে বললেন মা মনে মনে ভয় ছিল, দেবনাথ হয়তো দপ্ করে জ্বলে উঠবে

দেবনাথ কিন্তু শান্তভাবেই সবটা শুনলো। মুখের একটা রেখাও বদলালো না যেন ছোটগোছের কোনো ব্যাপারে সে আর রাগ করবে না প্রতিজ্ঞা করেছে

ধীর গলায় বললো, ঠিক আছে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে যা পাই ধার নেবো. তুমি বিয়ের তারিখ-টারিখ ছাখো।

—কিন্তু রমেন যে কোনো চাকরি-টাকরি করে না।

—আমিই খুঁজবো এখন চাকরি ওর জন্য—

—ওর বাবা মা'র সঙ্গেও তো কথা বলতে হবে। তাঁদের মত আছে কি না।

--সে দায়িত্ব রমেনের।

বীণা আজও যথাসময়ে খেয়ে-দেয়ে অফিস বেরিয়ে গেল। দীপুও বেরুবার জন্য উসখুস করছে। কিন্তু বাড়ির কাজ না চুকলে বেরুতে পারছে না। খাওয়া-দাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়লো। দেবনাথও বেরুলো একটু বাদে, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে একটু পড়তে যাবে। আর মা বিছানায় শুয়ে একটু চোখ বোজা মাত্র চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লো শিপ্রা।

ভবানীপুরে শিপ্রার কলেজের বন্ধু সুজাতা থাকে, মাস আষ্টেক আগে তার বিয়ে হয়েছে। দুপুর বেলা তার স্বামী বাড়িতে থাকে না, সেই সময় প্রায়ই শিপ্রা যায় তার সঙ্গে গল্প করতে। সুজাতাদের টেলিফোন আছে। সেখানে পেঁছে শিপ্রা বললো, জানিস্ সুজাতা আমার একটা দারুণ ভালো খবর আছে। সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কি রে? শিপ্রা বললো, দাঁড়া আগে ওকে ডাকি।

রমেনদের বাড়িতে ফোন নেই, কিন্তু পাশের বাড়িতে ফোন করলে ওদের ডেকে দেয়। সেই জন্যই প্রায়ই কোনো দুপুরেই রমেন বাড়ি থেকে বেরোয় না! শিপ্রার গলা শোনা মাত্র সে বললো, দাঁড়াও

এক্ষুনি আসছি। রমেন বেকার অথচ ট্যাক্সি ভাড়া করে ছুটে এলো সুজাতার ফ্ল্যাটে। প্রায় সুজাতার সামনেই শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরে আর কি।

শিপ্রা বললো, জানো, কাল মরতে বসেছিলাম প্রায়। একতলার ঘরে ঐ কঙ্কালটা পাওয়ার পর থেকে আমাদের সারা বাড়িটা এমন হয়ে আছে! কাল সন্ধ্যেবেলা আমি যা দেখলাম সবাই বলছে আমার চোখের ভুল!

কি দেখলি রে? কি দেখলি? সুজাতা জিজ্ঞেস করলো। সবিস্তারে গল্পটা শোনালো শিপ্রা—এখন দিনের বেলা অবশ্য ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তারপর বললো, ঐ রকম ব্যাপার হলো বলেই তো মাকে বলতে পারলুম। না হলে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না। মা—ও এত সহজে মেনে নিলেন।

রমেন বললো, মেনে না নিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, আমরা আগামী সপ্তাহে রেজিষ্ট্রী করতুমই।

শিপ্রা বললো, বাজে ব'কো না। মায়ের মত না পেলে আমার মনে কিছুতেই শান্তি আসতো না।

সুজাতা বললো, তা হলে তোদের ভূতটাকে তোর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত বল। ওর জন্য তো হলো অনেকটা।

শিপ্রা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, কালকে অজ্ঞান অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, ঐ কঙ্কালটা মেয়েরই কঙ্কাল ছিল, আমারই বয়সী। ওরও আমার মতো অবস্থা হয়েছিল, তারপর আত্মহত্যা করে।

—সবটা স্বপ্নে দেখলে?

—কি জানি স্বপ্নে দেখলাম না কল্পনা করেছি। মোটমাট আমার বিশ্বাস, ও ছিল ঠিক আমার মতো। তখনকার দিনে তো আত্মহত্যা ছাড়া উপায় ছিল না, এখন কত উপায় আছে। আমি কিন্তু মরতে পারতুম না। মরতে আমার দারুণ ভয় করে।

সুজাতার অলক্ষ্যে রমেন শিপ্রার একটা হাত ধরে একটু চাপ দিল। সুজাতা বললো, তা হলে রমেন, সবই যখন ঠিকঠাক হয়ে গেল তোমার উচিত আমাকে অন্তত একদিন খাওয়ানো। রমেন বললো, নিশ্চয়ই খাওয়াবো।

শিপ্রা বললো, আমার এত আনন্দ হচ্ছে না, যে কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

দীপু গিয়ে বসে রইলো ইউনিভারসিটি ক্যান্টিনে। দুটো আড়াইটের সময় সেখানে নবনীতা আসবেই।

নবনীতা আর তিনটে মেয়ের সঙ্গে এসে ঢুকেই দীপুকে দেখতে পেল। দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেল অন্য টেবিলে। সেখানে গিয়ে আবার তাকাতেই দেখলো, দীপু তার দিকেই চেয়ে আছে। নবনীতা আবার চোখ সরিয়ে নিলো। একটু বাদে আবার যেই তাকালো, আবার চোখাচোখি হলো। দীপু এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

খানিকটা বাদে নবনীতা যখন খাওয়া শেষ করে বন্ধুদের নিয়ে উঠে পড়লো, দীপুও উঠে দাঁড়ালো। একেবারে নবনীতার পাশাপাশি বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে, একটাও কথা বললো না।

নবনীতার বন্ধুরাও ঢুকে পড়লো ক্লাসে, নবনীতা বললো আমি আজ চলি রে, আমি এই ক্লাসটা কাটবো। বাড়িতে আজ দিদি জামাইবাবু আসবে।

লম্বা, করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে নবনীতা, দীপু তার কাছাকাছি, কেউ কোনো কথা বলছে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের বাইরে এসে ট্রাম ষ্টপে দীপু এমনিই স্বাগতোক্তি করলো, এখন ট্রামে খুব ভিড়।

নবনীতাও দীপুর দিকে তাকালো না। সে ও স্বগতোক্তি করলো যতই ভিড় হোক, আমাকে যেতে হবেই।

—না।

—হ্যাঁ।

— না।

নবনীতা আর কথা বাড়ালো না। হাঁটতে লাগলো হ্যারিসন রোডের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দীপু। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট পেরুবার পর দীপু আবার স্বগতোক্তি করলো, এত দিনে বুঝি একবারও খবর দেওয়া যেত না নবনীতাও স্বগতোক্তি করলো সবাই আমাকে ভুল বুঝবে কেন ?

— ভুল বোঝার সুযোগ দিলেই ভুল বুঝতে হয়।

নবনীতা দাঁড়ালো। এরপর সরাসরি তাকালো দীপুর দিকে। দীপু অপরাধীর মতো মুখ করে বললো, যাক্, আর কিছু বলতে হবে না।

—তুমি—

—বলছি তো, আর কখনো ভুল বুঝবো না।

এবার দু'জনেই হেসে ফেললো উজ্বল মুখে।

একটু বাদে কফি হাউসের টেবিলে মুখোমুখি বসে নবনীতা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বাড়িতে নাকি মানুষের হাড় বেরিয়েছে ?

—সে খবর রাখো দেখছি।

— আমি সব খবর রাখি। তুমি না রাখলে কি হয়।

—কে বলেছে তোমায় ?

—তা নিয়ে তোমার দরকার কি ? বাবাঃ বাড়ির মেঝেতে কঙ্কাল ? তারপরেও সে বাড়িতে মানুষ থাকে ? আর কিছু হয় নি ?

—হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে খুব ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে ?

—কি রকম ? কি হয়েছে বলো না

—একটা খুব মিষ্টি মেয়ে ভূত, সে কারুর কোনো ক্ষতি করে না। এক এক সময় এক এক জনের চেহারা ধরে আসে। সেই আমাকে তোমার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানের ভেতরে রেষ্টুর‍্যাণ্টে পাশাপাশি বসে আছে রীণা আর সুবিমল। দু'জনেই একটু চিন্তিত।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কাল বলেছিলে?

—না।

—আর কবে বলবে?

—হয়তো কোনোদিনই বলা হবে না। কাল ঐ কথা বলতে গিয়ে তার বদলে বলে এলাম, আমি ওকে ভালোবাসি।

সুবিমল একটু মুচকি হেসে বললো, ও তাই বুঝি?

রীণা ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল, হ্যাঁ তাই বলেছি। মিথ্যে কথা বলি নি, সত্যিই আমি ওকে ভালোবাসি।

—তাহলে সুবিমল ঘোষের তো বিদায় নেওয়াই উচিত।

—তাই নাও না। বাঁচি তাহলে।

—বিদায় নিতে পারছি কই। এমনভাবে বেঁধে রেখেছো কেন?

—তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারবে না, ও সত্যি খুব ভালোমানুষ।

—দেবনাথ যে ভালো মানুষ, তা তো আমি জানি।

—তা হলে এটা জানো না যে, কোনো সত্যিকারের ভালো মানুষকে কিছুতেই ঠকানো যায় না।

—ঠকাবার দরকারটা কি? আমি চলে যাচ্ছি!

—আজ চলে গিয়ে আবার কাল ফিরে আসবে?

—যদি বারণ করো, তাও আসবো না। চিরদিনের মতো চলে যাবো।

—পারবে?

– পারতেই হবে। এরকমভাবে তো আর চলে না।

—কিন্তু আমি যে পারবো না! সুবিমল তোমাকেও যে আমি সত্যিকারের ভালোবাসি।

—ছিঃ, বিবাহিতা মহিলার পক্ষে দু'জন পুরুষকে ভালবাসা মোটেই উচিত নয়।

—সুবিমল, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো ?

—একটুও করছি না।

—তাহলে আমি কি করবো বলে দাও !

ঝগড়াঝাটি না করে একদিন ঠাণ্ডা মাথায় দেবনাথকে সব খুলে বলো বলো যে, তুমি ঝোঁকের মাথায়, আমার ওপর রাগ করে ওকে বিয়ে .করেছিলে। কিন্তু তুমি যে ধরণের মেয়ে, যে ধরণের আবহাওয়ায় তুমি মানুষ, তাতে কিছুতেই তুমি ও বাড়িতে খাপ খাওয়াতে পারছো না। সুতরাং মিউচুয়াল কনসেণ্টে ডিভোর্স হওয়াই ভালো।

—আমি পারবো না, পারবো না। কিছুতেই পারবো না ! ওর তো কোনো দোষ নেই। ওকে তো আমি বললেই ও আলাদা বাড়িতে উঠে যেতে পারে।

—তাহলে বাড়িটা নিয়েই যত গণ্ডগোল ?

—সুবিমল, কেন তুমি বোম্বে থেকে আবার ফিরে এলে ? বেশ তো চাকরিতে বদলী হয়ে বোম্বে চলে গিয়েছিলে—

—বেশ তো, আবার চলে যাচ্ছি না হয় ?

—তুমি বুঝতে পারছো না, দেবনাথকে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর তো কোন দোষ নেই, আমি নিজেই তো ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম, আমাকে তো কেউ জোর করে বিয়ে দেয় নি ! আমি ওর জীবনটা এখন তছনছ করে দেব ?

—বেশ তো, দিও না। আমি বোম্বে ফিরে যাচ্ছি।

—তুমি এখানে ফ্ল্যাট পেয়েছো ?

—হ্যাঁ। কেন ?

—আমার মাথার ঠিক নেই। আমার একবার মনে হচ্ছে, আমি দেবনাথের ওপর অন্যায় করতে পারবো না আবার মনে হচ্ছে—তোমার সঙ্গে তোমার ফ্ল্যাটেই চলে যাই। চলো, তাই যাই। আমার চিন্তা ভাবনা করে দরকার নেই ?

—বসো, বসো, অত হুড়োহুড়ি করে এ সব হয় না। তুমি খুব

ভালো করে ভেবে ছাখো, দেবনাথ সম্পর্কে তোমার কোনো দুর্বলতা আছে কি না।

—হ্যাঁ, আছে। আমি জানি। ও আমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করে নি। এমন মানুষ সম্পর্কে কোনো মেয়ের দুর্বলতা না থেকে পারে ?

—তুমি আমার কাছে যদি চলে আসো ঝোঁকের মাথায়—তা হলে দেবনাথের জন্য তোমার মনে একটা অপরাধ বোধ থাকবে। তুমি শান্তি পাবে না। তুমি আমাকেও শান্তি দেবে না, দেবনাথেরও শান্তি নষ্ট করবে।

—তাছাড়া, আমি আর একটা কথা ভাবছি। দেবনাথের কাছে যদি আমি অবিশ্বাসী হই, তা হলে হয়তো একদিন তোমার কাছেও অবিশ্বাসী হবো। ঐ যে লোকটা অফিসের গেট থেকে আমার পেছন পেছন আসে, ওর চেহারা যদি একটু সুন্দর হতো, যদি ভদ্রভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতো—

—যাঃ তা হয় না।

—কেন হবে না ? মেয়েরা একবার অবিশ্বাসী হলে বারবার অবিশ্বাসীও হতে পারে। দেবনাথকে যদি ঠকাই, তাহলে আবার কখনো যে তোমাকেও ঠকাবো না—

—তাহলে দেবনাথকে না ঠকানোই তো উচিত মনে হচ্ছে।

—কোনো মেয়ে কি সত্যিই দু'জন পুরুষকে একসঙ্গে ভালোবাসতে পারে না ?

—পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু দু'জন পুরুষের কেউই তা সহ্য করে না। শোনো রীণা, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। আমরা তো আর ছেলেমানুষ নই ! ঝোঁকের মাথায় কিছু করা আমাদের মানায় না। তুমি আর কখনও আমাকে দেখা করতে বলো না। বরং দেবনাথকে সুখী করার চেষ্টা করো।

—আর তুমি ?

—আমি বোম্বে ফিরে যাবো।

—তোমাকে দেখলে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারবো না।

—আমি তোমার মাথা ঠিক রাখতে চাই। আর দেখা হবে না।

—সত্যি আর দেখা হবে না?

—না।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে, বাস বন্ধ ছিল বলে হেঁটেই ফিরছিল দেবনাথ। সর্টকাট করার জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মধ্যে ঢুকেছিল। রেস্তোরাঁটার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার চোখে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা সুবিমলের হাতের ওপর রীণার হাত! দু'জন দু'জনের দিকে প্রগাঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

বাগানটার অন্যান্য পাথরের মূর্তির মতো এক মুহূর্ত শুধু অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেবনাথ। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

সেদিন রাত্তিরে আর খাবার টেবিলে এক সঙ্গে খাওয়া হলো না। শিপ্রা বাড়ি ফিরে শরীর খারাপ, কিছু খাবে না বলে শুয়ে পড়েছে। আসলে সে হোটেলে খেয়ে এসেছে রমেনের সঙ্গে। দেবনাথ অনেক আগেই খেয়ে চলে গেছে নাইট ডিউটিতে। রীণাও একা খেয়ে নিয়ে ঢুকে গেছে নিজের ঘরে। মা দীপুকে একা খেতে দিয়েছেন।

কাঞ্চা চাকরটা কিছুতেই আর এ বাড়িতে থাকতে চায় না। কিছুক্ষণ আগে সে জামা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে চলে গেছে কাছাকাছি কোনো বাড়িতে তার গাঁও কা আদমির সঙ্গে শুতে। দীপুর ধারণা ওকে নিশ্চয়ই কেউ কয়েক টাকা বেশী মাইনের চাকরির লোভ দেখিয়েছে, তাই ভূতের অজুহাত দেখিয়ে চলে গেল!

দীপুকে আগে বলা হয় নি। খাবার টেবিলেই মা দীপুকে শিপ্রার কথাটা বললেন। দীপু তখন নবনীতার সঙ্গে আবার ভাব হয়ে যাওয়ায় এমন ডগোমগো যে, ব্যাপারটাতে সে তখন গুরুত্বই

দিল না একদিন যদিও রমেনকে সে যথেষ্ট অপমান করেছিল কিন্তু আজ বললো, ঠিক আছে, দাদার যদি আপত্তি না থাকে তা'হলে আর আমার বলার কি আছে !

আজ দীপু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবু মাঝ রাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা মেয়েলি গলায় কান্নার আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছে ! চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী মূর্তি। নীল কিংবা কালো রঙের শাড়ি, একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে।

দীপু ভালো করে চোখ দুটো রগড়ালো। কালকের মতো ভুল দেখছে না তো ? না, কোনো ভুল নেই। দীপুর দিকে পেছন ফেরা হলেও নারী মূর্তি যে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

আজ আর দীপুর কিন্তু ভয় হলো না। অশরীরী কিছু যদি সত্যিই থাকে, আজ দীপু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিতে চায়।

একটুও শব্দ না করে দীপু খাট থেকে নামল। আস্তে আস্তে চটিটা তুলে নিল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। মেয়েটি হাতের ওপর মাথা রেখে হেঁচকি তুলে কাঁদছে !

মেয়েটির কাছাকাছি গিয়ে দীপুর আবার একটু ভয় করতে লাগলো। এ ঠিক ভয়ংকর ভয় নয়, খানিকটা যেন মাদকতা মাখানো ভয়।

আর কাছে গেল না। দীপু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে ?

মেয়েটি চমকে সোজা হয়েই দীপুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। দীপু দেখলো বৌদি। তবু সতর্ক ভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখতে লাগলো। যদি সত্যিই বৌদি না হয়। যদি বৌদির মতো চেহারা নিয়ে ধ্যাৎ। বাজে চিন্তা।

দীপু জিজ্ঞেস করলো, বৌদি ? তুমি ?

বীণা ততক্ষণে দ্রুত আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলেছে। বললো, হ্যাঁ ভাই আমি। তুমি ঘুম থেকে উঠে পড়লে কেন ?

—তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছো ?

—এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। দোতলায় অসহ্য গরম, ঘুম আসছিল না!

দীপু এবার এগিয়ে গিয়ে বৌদির পিঠে একটা হাত রেখে অনুভব করে নিল। তারপর বললো, বৌদি তুমি কাঁদছিলে?

—কই, না তো।

—হ্যাঁ, আমি শুনেছি। দাদার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

—না, ঝগড়া হবে কেন? দাদা-বৌদির ঝগড়ার ব্যাপারে ছোট ভাইয়ের কৌতুহল দেখাতে নেই।

—বৌদি, তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো?

—কি আবার হবে। এমনিই গরমের জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—এত রাত্তিরে, ছাদে? আমাকে ডাকলেও পারতে। যদি হঠাৎ ভয়-টয় পেতে। কাল শিপ্রা যে কাণ্ড করলো—

— আমার ভয় করে না।

—তোমার ভয় করে না? যদি সামনে কেউ এসে দাঁড়াতো হঠাৎ মনে করো সেই মেয়েটিই যদি—

—কোন মেয়েটি?

—যার হাড় পাওয়া গেছে।

—সে যে মেয়েই ছিল সত্যিকারের, তা কি ঠিক হয়েছে!

—ও আমি ঠিক জানি।

রীণা একটুখানি সরে দাঁড়িয়ে বললো, তা, তাকে দেখলেই বা আমি ভয় পাবো কেন? তার সঙ্গে না হয় গল্প করতাম। জিজ্ঞেস করতাম সে মরলো কি করে? ওখানে পুতে রেখেছিল কেন এই সব। কিংবা জিজ্ঞেস করতাম, তারও আমার মতো-একটা দুঃখ ছিল কিনা?

—বৌদি তোমার কি দুঃখ আমায় বলো—

—দীপু চলো, এবার শুতে যাওয়া যাক্।

—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো, আমি জানি, তুমি কাঁদছিলে। তোমার

কি দুঃখ আমায় বলো, আমি যদি পারি—

ভারী অদ্ভুত এক রহস্যময়ভাবে হাসলো বীণা। সেই হাসির মধ্যে অনেক কিছু মিশে আছে, খানিকটা উদাসীনভাবে বললো, মেয়েদের দুঃখ ছেলেরা কখনও বুঝতে পারে না। ওকথা ছেলেদের কাছে বলতে নেই।